# ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের অধিকার

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র.)

# ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের অধিকার

**সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী**

**ISBN-984-32-0910-9**



প্রকাশনায়
**আহসান পাবলিকেশন**
১৯১ বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন : ৮৩৫৩১২৭

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর, ২০০৩
দ্বিতীয় প্রকাশ : ফেব্রুয়ারী, ২০০৮

প্রচ্ছদ : এম জি এ আলমগীর

কম্পোজ :
আহসান কম্পিউটার
কাটাবন, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৬৭০৬৮৬

মুদ্রণ : আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩ বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

**নির্ধারিত মূল্য ঃ ত্রিশ টাকা মাত্র**

---

**ISLAMI RASTRE OMUSLIMDER ADHIKER** by Sayyid Abul Ala Maudoodi Translated into Bengoli by Sayyid Abul Ala Maudoodi Research Academy Published by Ahsan Publication, Dhaka First Edition October, 2003 Second Edition February 2008 Net Price : Tk. 30.00 ($ 1.00) only

**AP-2008/18**

# আমাদের কথা

ইসলাম মানুষের স্রষ্টা মহান আল্লাহ তায়ালার প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থা। মানুষের সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যে মানুষকে জীবন যাপনের জন্যে তিনি যে জীবন ব্যবস্থা প্রদান করেছেন তারই নাম 'ইসলাম'। ইসলাম মানুষের জন্যে পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ও কার্যকর হওয়ার মাধ্যমেই ইসলামের পূর্ণাঙ্গ রূপ প্রকাশ পায়। তাই মুসলমানদের জনবসতিতে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত ও কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া মুসলমানদের জন্যে অপরিহার্য কর্তব্য।

যে জনবসতিতে ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে সে রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকরা কি অধিকার ও মর্যাদা লাভ করবে- সেটা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। মূলত সে বিষয়টির দিক নির্দেশনা আল কুরআন ও সুন্নাহ্‌তেই রয়েছে। কুরআন-সুন্নাহর আলোকে মনীষীগণ এ বিষয়ে রূপরেখাও পেশ করেছেন।

এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত অথচ মৌলিক ও তথ্যবহুল বক্তব্য রেখেছেন বিশ শতকের সেরা ইসলামী মনীষী মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র)। তাঁর 'ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের অধিকার' পুস্তিকাটি এ বিষয়ের একটি প্রামাণিক দলিল।

বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে ইসলামী রাষ্ট্রের দাবি ক্রমেই জোরদার হয়ে উঠছে। সে সাথে এখানে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে অমুসলিমদের অধিকার ও মর্যাদা কি হবে- সেই প্রশ্নও সামনে এসেছে। আমরা আশা করি আল উস্তায আবুল আ'লা মওদূদীর এ পুস্তিকাটি থেকে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা যাবে।

বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবার কারণে পুস্তিকার শেষভাগে আমরা লেখকের এ সংক্রান্ত আরো কিছু লেখা সংযোজন করে দিয়েছি। এতে পুস্তিকাটি আরো সমৃদ্ধ হলো।

আবদুস শহীদ নাসিম
পরিচালক
সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী, ঢাকা।

# সূচিপত্র


- অমুসলিমদের অধিকার ৫
- অমুসলিম নাগরিক কতো প্রকার ৭
- অমুসলিম নাগরিকদের সাধারণ অধিকার ১১
- মুসলিম ফকীহদের সমর্থন ২২
- অমুসলিমদের যে সব বাড়তি অধিকার দেয়া যায় ২৪
- সংযোজন-১ ৩০
  - অমুসলিমদের অধিকার ৩০
- সংযোজন-২ ৩৩
  - নাগরিকত্ব ও তার ভিত্তি ৩৩
- সংযোজন-৩ ৪১
  - অমুসলিমদের অধিকার : কতিপয় মৌলিক প্রশ্নের জবাব ৪১

# অমুসলিমদের অধিকার

ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করার আগে এ কথা বুঝে নেয়া দরকার, ইসলামী রাষ্ট্র একটা আদর্শবাদী [Ideological] রাষ্ট্র। এর ধরন ও প্রকৃতি জাতীয় গণতান্ত্রিক [National Democratic] রাষ্ট্র থেকে একেবারেই ভিন্ন। এই উভয় ধরনের রাষ্ট্রের প্রকৃতিগত পার্থক্যের দরুন আলোচ্য বিষয়ের ওপর কিরূপ প্রভাব পড়ে, সেটা নিম্নোক্ত বক্তব্যসমূহ দ্বারা ভালোভাবে বুঝা যাবে :

| ইসলামী রাষ্ট্র | জাতীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র |
|---|---|
| ১. যে আদর্শ ও মূলনীতির ওপর ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত, তাকে কে মানে আর কে মানে না, সে হিসেবেই ইসলামী রাষ্ট্র তার নাগরিকদের বিভক্ত করে থাকে। ইসলামী পরিভাষায় উক্ত দুই ধরনের জনগোষ্ঠীকে যথাক্রমে মুসলিম ও অমুসলিম বলা হয়ে থাকে। | ১. যে জাতি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক, কারা সেই জাতির বংশোদ্ভূত আর কারা তা নয়, তার ভিত্তিতেই একটা জাতীয় রাষ্ট্র তার নাগরিকদেরকে বিভক্ত করে ফেলে। আধুনিক পরিভাষায় উক্ত দু'ধরনের জনগোষ্ঠীকে যথাক্রমে সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘু বলা হয়ে থাকে। |
| ২. ইসলামী রাষ্ট্র চালানো তার আদর্শ ও মূলনীতিতে বিশ্বাসীদের কাজ। এ রাষ্ট্র স্বীয় প্রশাসনে অমুসলিমদের সেবা গ্রহণ করতে পারে বটে, তবে নীতি নির্ধারক ও প্রশাসনের পদ তাদের দিতে পারে না। | ২. জাতীয় রাষ্ট্র স্বীয় নীতি নির্ধারণ ও প্রশাসনের কাজে শুধু আপন জাতির লোকদের ওপরই নির্ভর করে। অন্যান্য সংখ্যালঘু নাগরিকদের এ ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য মনে করা হয় না। এ কথাটা স্পষ্ট করে বলা না হলেও কার্যত এটাই হয়ে থাকে। সংখ্যালঘুদের কোনো ব্যক্তিকে যদি কখনো কোনো শীর্ষস্থানীয় |

পদ দেয়াও হয়, তবে তা নিছক লোক দেখানো ব্যাপার হয়ে থাকে। রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণে তার কোনোই ভূমিকা থাকে না।

৩. ইসলামী রাষ্ট্রের প্রকৃতিই এমন যে, সে মুসলিম ও অমুসলিমদের সুস্পষ্টভাবে দু'ভাগে বিভক্ত করতে বাধ্য। অমুসলিমদের কি কি অধিকার দিতে পারবে আর কি কি অধিকার দিতে পারবে না তা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেয়া তার পক্ষে অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়।

৩. জাতীয় রাষ্ট্রের পক্ষে এরূপ দ্বিমুখী আচরণ করা নিতান্তই সহজ কাজ যে, সে দেশের সকল অধিবাসীকে নীতিগতভাবে এক জাতি আখ্যায়িত করে কাগজে কলমে সকলকে সমান অধিকার দিয়ে দেবে। কিন্তু কার্যত সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘু ভেদাভেদ পুরোপুরি বহাল রাখবে এবং সংখ্যালঘুদের বাস্তবিক পক্ষে কোনো অধিকারই দেবে না।

৪. ইসলামী রষ্ট্রে তার প্রশাসনে অমুসলিমের উপস্থিতি জটিলতার সমাধান এভাবে করে যে, তাদেরকে সুনির্দিষ্ট অঙ্গিকারের কার্যকর নিশ্চয়তা [Guarantee] দিয়ে সন্তুষ্ট করে দেয়। নিজেদের নীতি নির্ধারণী ব্যবস্থাপনায় তাদের হস্তক্ষেপ বন্ধ করে এবং তাদের জন্য সব সময় এ ব্যাপারে দরজা খোলা রাখে যে, ইসলামী আদর্শ যদি তাদের ভালো লেগে যায় তাহলে তারা তা গ্রহণ করে শাসক দলের অন্তর্ভুক্ত হয় যেতে পারে।

৪. একটি জাতীয় রাষ্ট্র স্বীয় রাষ্ট্র কাঠামোতে বিজাতীয় লোকদের উপস্থিতি জনিত জটিলতার সমাধান তিন উপায়ে করে। প্রথমতঃ তাদের স্বতন্ত্র জাতিসত্তাকে ক্রমান্বয়ে বিলুপ্ত করে নিজেদের জাতিসত্তার বিলীন করে নেয়। দ্বিতীয়তঃ তাদের জাতিসত্তাকে নির্মূল করার জন্য হত্যা, লুটতরাজ ও দেশান্তরিতকরণের নিপীড়নমূলক কর্মপন্থা অবলম্বন করে। তৃতীয়তঃ তাদেরকে নিজেদের ভেতরে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক

বানিয়ে রেখে দেয়। দুনিয়ার জাতীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোতে এই তিনটি কর্মপন্থা ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়েছে এবং এখনও গৃহীত হয়ে চলেছে। আজকের ভারতে খোদ মুসলমানদেরকে এসব নির্যাতনমূলক ব্যবস্থার তিক্ত অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

৫. ইসলামী রাষ্ট্র অমুসলিম সংখ্যালঘু নাগরিকদেরকে শরীয়ত প্রদত্ত অধিকারগুলো দিতে বাধ্য। এসব অধিকার কেড়ে নেয়া বা কমবেশী করার এখতিয়ার কারো নেই। এসব অধিকার ছাড়া অতিরিক্ত কিছু অধিকার যদি মুসলমানরা দিতে চায় তবে ইসলামের মূলনীতির পরিপন্থী না হলে তা দিতে পারে।

৫. জাতীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সংখ্যালঘুদেরকে যে অধিকারই দেয়া হয় তা সংখ্যাগুরুর দেয়া অধিকার। সংখ্যাগুরুরা ওসব অধিকার যেমন দিতে পারে তেমন তাতে কমবেশী করা বা একেবারে ছিনিয়ে নেয়ারও অধিকার রাখে। এ ধরনের রাষ্ট্রে সংখ্যালঘুরা পুরোপুরিভাবে সংখ্যাগুরুর করুণার ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকে। তাদের জন্য মৌলিক মানবাধিকারের পর্যন্ত

উল্লেখিত মৌলিক পার্থক্যগুলো থেকে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়, অমুসলিম সংখ্যালঘুদের সাথে ইসলামী রাষ্ট্রের আচরণ এবং লংখ্যালঘু জাতির সাথে জাতীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আচরণে কি আকাশ পাতাল ব্যবধান। এ ব্যবধানকে বিবেচনায় না আনলে মানুষ এই ভুল বুঝাবুঝি থেকে মুক্ত হবে না যে, আধুনিক যুগের জাতীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো সংখ্যালঘুদেরকে সমানাধিকার দেয় আর ইসলাম এ ব্যাপারে সংকীর্ণতার পরিচয় দেয়।

এই অত্যাবশ্যকীয় বিশ্লেষণের পর আমি মূল আলোচ্য বিষয়ে ফিরে যেতে চাই।

## ১. অমুসলিম নাগরিক কতো প্রকার?

ইসলামী আইন অমুসলিম নাগরিকদের তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করে :

এক. যারা সন্ধি বা চুক্তি বলে ইসলামী রাষ্ট্রের আওতাভুক্ত হয়েছে।

দুই. যারা যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ইসলামী রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে এসেছে।

তিন. যারা যুদ্ধ কিংবা সন্ধি ছাড়া অন্য কোনো পন্থায় ইসলামী রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

যদিও উক্ত তিন প্রকারের নাগরিকরাই সংখ্যালঘু অমুসলিমদের জন্য নির্ধারিত সাধারণ অধিকারগুলোতে সমভাবে অংশীদার, কিন্তু প্রথমোক্ত দুই শ্রেণী সংক্রান্ত বিধিতে সামান্য কিছু পার্থক্যও রয়েছে। তাই অমুসলিম সংখ্যালঘুদের অধিকার বিশদভাবে বর্ণনা করার আগে আমি এই বিশেষ দুটি শ্রেণীর আলাদা আলাদা বিধান বর্ণনা করবো।

### চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম নাগরিক

যারা যুদ্ধ ছাড়া অথবা যুদ্ধ চলাকালে বশ্যতা স্বীকার করতে সম্মত হয়ে যায় এবং ইসলামী সরকারের সাথে সুনির্দিষ্ট শর্তাবলী স্থির করে সন্ধিবদ্ধ হয় তাদের জন্য ইসলামের বিধান এই যে, তাদের সাথে সকল আচরণ তাদের সাথে সম্পাদিত চুক্তির শর্তানুযায়ী করা হবে। আজকালকার সভ্য জাতিগুলো এরূপ রাজনৈতিক ধড়িবাজীতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে যে, শত্রু পক্ষকে বশ্যতা স্বীকারে উদ্বুদ্ধ করার জন্য কিছু উদার শর্ত নির্ধারণ করে নেয়। তারপর যেই তারা পুরোপুরি আয়ত্তে এসে যায় অমনি শুরু হয়ে যায় ভিন্ন ধরনের আচরণ। কিন্তু ইসলাম এটাকে হারাম ও মহাপাপ গণ্য করে। কোনো জাতির সাথে যখন কিছু শর্ত স্থির করা হয়ে যায় (চাই তা মনোপুত হোক বা না হোক) এখন তাতে চুল পরিমাণও হেরফের করা যাবে না। চাই উভয় পক্ষের আপেক্ষিক অবস্থান, শক্তি ও ক্ষমতায় [Relative position] যতোই পরিবর্তন এসে থাক না কেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

> "যদি তোমরা কোনো জাতির সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হও, বিজয়ী হও এবং সেই জাতি নিজেদের ও নিজেদের সন্তানদের প্রাণ রক্ষার্থে তোমাদের

মুক্তিপণ দিতে রাযী হয় (অপর বর্ণনায় আছে যে, তোমাদের সাথে কোনো সন্ধিপত্র সম্পাদন করে) তাহলে পরবর্তী সময়ে ঐ নির্ধারিত মুক্তিপণের চেয়ে কণা পরিমাণও বেশী নিও না। কেননা সেটা তোমাদের জন্য বৈধ হবে না।" [আবু দাউদ, কিতাবুল জিহাদ]

অপর হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

"সাবধান! যে ব্যক্তি কোনো চুক্তিবদ্ধ নাগরিকের ওপর যুলুম করবে কিংবা তার প্রাপ্য অধিকার থেকে তাকে কম দেবে, তার সামর্থের চেয়ে বেশী বোঝা তার ওপর চাপাবে অথবা তার কাছ থেকে কোনো জিনিস তার সম্মতি ছাড়া আদায় করবে, এমন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কিয়ামতের দিন আমি নিজেই ফরিয়াদী হবো।" [আবু দাউদ, কিতাবুল জিহাদ]

উক্ত উভয় হাদীসের ভাষা ব্যাপক অর্থবোধক। তাই ঐ হাদীস দুটি থেকে এই সাধারণ বিধি প্রণয়ন করা হয় যে, চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম নাগরিকদের সাথে সন্ধিপত্রে যেসব শর্ত নির্ধারিত হবে, তাতে কোনো রকম কমবেশী করা কোনোক্রমেই জায়েয হবে না। তাদের ওপর কর খাজনাও বাড়ানো যাবে না। তাদের জমিজমাও দখল করা যাবে না, তাদের ঘরবাড়ী দালান কোঠাও কেড়ে নেয়া যাবে না। তাদের ওপর কড়া ফৌজদারী দণ্ডবিধিও চালু করা যাবে না, তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতায়ও হস্তক্ষেপ করা যাবে না। তাদের ইজ্জত সম্মানেরও ক্ষতি করা যাবে না এবং তাদের সাথে এমন কোনো আচরণ করা যাবে না, যা যুলুম, অধিকার হরণ, সামর্থের মাত্রারিক্ত বোঝা চাপানো অথবা সম্মতি ব্যতিরেকে সম্পত্তি হস্তগত করার পর্যায়ে পড়ে। এই নির্দেশাবলীর কারণেই ফকীহগণ সন্ধি বলে বিজিত জাতিগুলো সম্পর্কে কোনো আইন প্রণয়ন করেননি বরং শুধুমাত্র একটি সাধারণ সংক্ষিপ্ত বিধি প্রণয়ন করেই ক্ষান্ত থেকেছেন। সেটি এই যে, তাদের সাথে আমাদের আচরণ হুবহু সন্ধির শর্ত অনুসারে পরিচালিত হবে। ইমাম আবু ইউসুফ লিখেছেন :

"তাদের সন্ধিপত্রে যা নেয়া স্থির হয়েছে, তাদের কাছ থেকে শুধু তাই নেয়া হবে। তাদের সাথে সম্পাদিত সন্ধির শর্ত পূরণ করা হবে। কোনো কিছু বাড়ানো হবে না। [কিতাবুল খারাজ, পৃষ্ঠা ৩৫]

## যুদ্ধে বিজিত অমুসলিম নাগরিক

দ্বিতীয় প্রকারের অমুসলিম নাগরিক হচ্ছে যারা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মুসলমানদের সাথে লড়াই করেছে এবং ইসলামী বাহিনী যখন তাদের সকল প্রতিরোধ ভেংগে তাদের আবাসিক এলাকায় প্রবেশ করেছে, কেবল তখনই অস্ত্র সংবরণ করেছে। এ ধরনের বিজিতদেরকে যখন "সংরক্ষিত নাগরিকে" (যিম্মী) পরিণত করা হয়, তখন তাদের কয়েকটি বিশেষ অধিকার দেয়া হয়। ফিক্হ্ শাস্ত্রীয় গ্রন্থাবলীতে এর বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। নিম্নে এই সকল বিধির একটা সংক্ষিপ্তসার দেয়া হচ্ছে। এ থেকে এই শ্রেণীর অমুসলিম নাগরিকদের সাংবিধানিক মর্যাদা ও অবস্থান স্পষ্ট হয়ে যাবে :

১. মুসলমানদের সরকার তাদের কাছ থেকে জিযিয়া গ্রহণ করা মাত্রই তাদের সাথে সংরক্ষণ চুক্তি সম্পাদিত হয়ে যাবে এবং তাদের জান ও মালের হিফাযত করা মুসলমানদের জন্য ফরয হয়ে যাবে। কেননা জিযিয়া গ্রহণ করা মাত্রই প্রমাণিত হয় যে, জান ও মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে। [বাদায়েউস্ সানায়ে, ৭ম খণ্ড, ১১১ পৃষ্ঠা]

এরপর মুসলিম সরকারের বা সাধারণ মুসলমানদের এ অধিকার থাকে না যে, তাদের সম্পত্তি দখল করবে বা তাদেরকে দাসদাসী বানাবে। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হযরত আবু উবায়দাকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় লিখেছিলেন :

> "যখন তুমি তাদের কাছ থেকে জিযিয়া গ্রহণ করবে, তখন তোমার আর তাদের ওপর হস্তক্ষেপ করার অধিকার থাকবে না।" [কিতাবুল খারাজ, পৃষ্ঠা ৮২]

২. "সংরক্ষিত নাগরিকে" (যিম্মী) পরিণত হয়ে যাওয়ার পর তাদের জমির মালিক তারাই হবে। সেই জমির মালিকানা উত্তরাধিকার সূত্রে হস্তান্তরিত হবে এবং তারা নিজেদের সম্পত্তি বেচা, কেনা, দান করা ও বন্ধক রাখা ইত্যাদির নিরংকুশ অধিকারী হবে। ইসলামী সরকার তাদেরকে বেদখল করতে পারবে না। [ফাতহুল কাদীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৫৯]

৩. জিযিয়ার পরিমাণ তাদের আর্থিক অবস্থা অনুযায়ী নির্ধারিত হবে। যারা ধনী তাদের কাছ থেকে বেশী, যারা মধ্যবিত্ত তাদের কাছ থেকে কিছু

কম এবং যারা দরিদ্র তাদের কাছ থেকে অনেক কম নেয়া হবে। আর যার কোনো উপার্জনের ব্যবস্থা নেই অথবা যে অন্যের দান-দক্ষিণার ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকে, তার জিযিয়া মাফ করে দেয়া হবে। জিযিয়ার জন্য যদিও কোনো বিশেষ পরিমাণ নির্দিষ্ট নেই, তবে তা অবশ্যই এভাবে নির্ধারিত হওয়া চাই যাতে তা দেয়া তাদের পক্ষে সহজ হয়। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু ধনীদের ওপর মাসিক এক টাকা, মধ্যবিত্তদের ওপর মাসিক ৫০ পয়সা এবং গরীব লোকদের ওপর মাসিক ২৫ পয়সা জিযিয়া আরোপ করেছিলেন। [কিতাবুল খারাজ পৃষ্ঠা : ৩৬]

৪. জিযিয়া শুধুমাত্র যুদ্ধ করতে সক্ষম লোকদের ওপর আরোপ করা হবে। যারা যুদ্ধ করতে সমর্থ নয়, যথা শিশু, নারী, পাগল, অন্ধ, পংগু, উপাসনালয়ের সেবক, সন্যাসী, ভিক্ষু, খুনখুনে বৃদ্ধ। বছরের উল্লেখযোগ্য সময় রোগে কেটে যায় এমন রোগী, এবং দাস দাসী ইত্যাদিকে জিযিয়া দিতে হবে না। [বাদায়ে, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১১১-১১৩; ফাতহুল কাদীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭৩, ৩৭২; কিতাবুল খারাজ, পৃষ্ঠা ৭৩]

৫. যুদ্ধের মাধ্যমে দখলীকৃত জনপদের উপাসনালয় দখল করার অধিকার মুসলমানদের রয়েছে। তবে সৌজন্য বশত এই অধিকার ভোগ করা থেকে বিরত থাকা এবং উপাসনালয়গুলোকে যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থায় বহাল রাখা উত্তম। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর আমলে যতো দেশ বিজিত হয়েছে তার কোথাও কোনো উপাসনালয় ভাঙ্গা হয়নি বা তাতে কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ করা হয়নি। ইমাম আবু ইউসুফ লিখেছেন :

> "সেগুলোকে যেমন ছিলো তেমনভাবেই রাখা হয়েছে। ভাঙ্গা হয়নি বা তাতে কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ করা হয়নি।" [কিতাবুল খারাজ, পৃষ্ঠা ৮৩]

তবে প্রাচীন উপাসনালয়গুলোকে ধ্বংস করা কোনো অবস্থায়ই বৈধ নয়। [বাদায়ে, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১১৪]

## ২. অমুসলিম নাগরিকদের সাধারণ অধিকার

এবার আমি অমুসলিম নাগরিকদের সাধারণ অধিকারগুলো বর্ণনা করবো। উল্লেখিত তিন শ্রেণীর নাগরিকের সকলেই এ অধিকারগুলোতে অংশীদার।

## প্রাণের নিরাপত্তা

অমুসলিম নাগরিকের রক্তের মূল্য মুসলমানদের রক্তের মূল্যের সমান। কোনো মুসলমান যদি অমুসলিম নাগরিককে হত্যা করে, তাহলে একজন মুসলমান নাগরিককে হত্যা করলে যেমন তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হতো ঠিক তেমনি মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমলে জনৈক মুসলমান অমুসলিমকে হত্যা করলে তিনি খুনীকে মৃত্যুদণ্ড দেন। তিনি বলেন :

> "যে নাগরিকের নিরাপত্তার দায়িত্ব নেয়া হয়েছে, তার রক্তের বদলা নেয়ার দায়িত্ব আমারই।" [ইনায়া শরহে হিদায়া, ৮ম খণ্ড, ২৫৬ পৃষ্ঠা]

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর আমলে বকর বিন ওয়ায়েল গোত্রের এক ব্যক্তি জনৈক হীরাবাসী অমুসলিম যিম্মীকে হত্যা করে। তিনি খুনীকে নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের হাতে সমর্পণের আদেশ দেন। অতঃপর তাকে উত্তরাধিকারীদের হাতে সমর্পণ করা হলে তারা তাকে হত্যা করে। [বুরহান শরহে মাওয়াহিবুর রহমান, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৮৭]

হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর আমলে হযরত ওমরের ছেলে উবায়দুল্লাহকে হত্যার পক্ষে ফতোয়া দেয়া হয়। কেননা তিনি হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর হত্যার সাথে জড়িত থাকার সন্দেহে হরমুযান ও আবু লুলুর মেয়েকে হত্যা করেন।

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর আমলে জনৈক মুসলমান জনৈক অমুসলিমের হত্যার দায়ে গ্রেফতার হয়। যথারীতি দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর তিনি মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেন। এই সময় নিহত ব্যক্তির ভাই এসে বললো, "আমি মাফ করে দিয়েছি।" কিন্তু তিনি তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে বললেন, "ওরা বোধ হয় তোমাকে ভয় দেখিয়েছে।" সে বললো, "না, আমি রক্তপণ পেয়েছি এবং আমি বুঝতে পারছি যে, ওকে হত্যা করলে আমার ভাই ফিরে আসবে না।" তখন তিনি খুনীকে ছেড়ে দিলেন এবং বললেন :

> "আমাদের অধীনস্থ অমুসলিম নাগরিকদের রক্ত আমাদের রক্তের মতোই এবং তাদের রক্তপণ আমাদের রক্তপণের মতোই।" [বুরহান, ২য় খণ্ড, ২৮২ পৃষ্ঠা]।

অপর এক বর্ণনা মুতাবিক হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেছিলেন :

"তারা আমাদের নাগরিক হতে রাযী হয়েছেই এই শর্তে যে, তাদের সম্পত্তি আমাদের সম্পত্তির মতো এবং তাদের রক্ত আমাদের মতো মর্যাদাসম্পন্ন হবে।"

এ কারণেই ফকীহগণ এই বিধি প্রণয়ন করেছেন যে, কোনো অমুসলিম নাগরিক কোনো মুসলমানের হাতে ভুলক্রমে নিহত হলে তাকেও অবিকল সেই রক্তপণ দিতে হবে, যা কোনো মুসলমানের নিহত হবার ক্ষেত্রে দিতে হয়। [দুর্‌রুল মুখতার, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২০৩]

## ফৌজদারী দণ্ডবিধি

ফৌজদারী দণ্ডবিধি মুসলিম অমুসলিম সকলের জন্য সমান। অপরাধের যে সাজা মুসলমানকে দেয়া হয়, অমুসলিম নাগরিককেও তাই দেয়া হবে। অমুসলিমের জিনিস যদি মুসলমান চুরি করে, কিংবা মুসলমানের জিনিস যদি অমুসলিম চুরি করে, তাহলে উভয় ক্ষেত্রেই চোরের হাত কেটে ফেলা হবে। কারো ওপর ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ আরোপ করলে অপবাদ আরোপকারী মুসলমানই হোক আর অমুসলমানই হোক উভয়কে একই শাস্তি দেয়া হবে। অনুরূপভাবে ব্যভিচারের শাস্তিও মুসলিম ও অমুসলিমের জন্য একই রকম। তবে মদের বেলায় অমুসলিমদেরকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে।[১]

## দেওয়ানী আইন

দেওয়ানী আইনেও মুসলমান ও অমুসলমান সমান। "তাদের সম্পত্তি আমাদের সম্পত্তির মতো" হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর এই উক্তির তাৎপর্য এই যে, মুসলমানের সম্পত্তি যেভাবে হিফাযত করা হয়

১. কিতাবুল খারাজ, পৃ. ২০৮, ২০৯; আল-মাব্‌সূত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৫৭-৫৮। ইমাম মালেকের মতে অমুসলিমকে মদের ন্যায় ব্যভিচারের শাস্তি থেকেও অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। ইমাম মালেকের অভিমতের উৎস হলো হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু ও হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর এই সিদ্ধান্ত যে, অমুসলিম নাগরিক ব্যভিচার করলে তার ব্যাপারটা তাদের সম্প্রদায়ের ওপর ছেড়ে দিতে হবে। অর্থাৎ তাদের ধর্মীয় বা পারিবারিক আইন অনুসারে কাজ করতে হবে।

অমুসলিমের সম্পত্তির হিফাযতও অদ্রূপ সাম্যের অনিবার্য দাবী অনুসারে দেওয়ানী আইনের আলোকে মুসলমানের ওপর যেসব দায় দায়িত্ব অর্পিত হয় অমুসলিমের ওপরও তাই অর্পিত হবে।

ব্যবসায়ের যেসব পন্থা আমাদের জন্য নিষিদ্ধ, তা তাদের জন্যও নিষিদ্ধ। তবে অমুসলিমরা শুধুমাত্র শূকরের বেচাকেনা, খাওয়া এবং মদ বানানো, পান ও কেনাবেচা করতে পারবে। [আল-মাবসূত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৩৭-৩৮]

কোনো মুসলমান কোনো অমুসলিমের মদ বা শূকরের ক্ষতি সাধন করলে তার ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে। দুর্‌রে মুখতারে আছে :

"মুসলমান যদি মদ ও শূকরের ক্ষতি করে তবে তার মূল্য দিতে বাধ্য থাকবে।" [৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৭৩]

## সম্মানের হিফাযত

কোনো মুসলমানকে জিহ্বা বা হাত পা দিয়ে কষ্ট দেয়া, গালি দেয়া, মারপিট করা বা গীবত করা যেমন অবৈধ, তেমনি এসব কাজ অমুসলিমের বেলায়ও অবৈধ। দুর্‌রুল মুখতারে আছে :

"তাকে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব এবং তার গীবত করা মুসলমানের গীবত করার মতোই হারাম।" [৩য় খণ্ড, পৃঃ. ২৭৩-২৭৪]

## অমুসলিমদের চিরস্থায়ী নিরাপত্তা

অমুসলিমদের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার চুক্তি মুসলমানদের জন্য চিরস্থায়ীভাবে বাধ্যতামূলক অর্থাৎ এই চুক্তি করার পর তারা তা ভাংতে পারে না। অপরদিকে অমুসলিমদের এখতিয়ার আছে যে, তারা যতোদিন খুশী তা বহাল রাখতে পারে এবং যখন ইচ্ছা ভেংগে দিতে পারে 'বাদায়ে' নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে :

"অমুসলিমদের নিরাপত্তার গ্যারান্টি দানের চুক্তি আমাদের জন্য বাধ্যতামূলক। মুসলমানরা কোনো অবস্থাতেই তা ভাংতে পারে না। পক্ষান্তরে অমুসলিমদের পক্ষে তা বাধ্যতামূলক নয়। অর্থাৎ তারা যদি আমাদের নাগরিকত্ব ত্যাগ করতে চায় তবে তা করতে পারে।" [দুর্‌রুল মুখতার, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১১২]

অমুসলিম নাগরিক যতো বড় অপরাধই করুক, তাদের রাষ্ট্রীয় রক্ষাকবচ সম্বলিত নাগরিকত্ব বাতিল হয় না। এমনকি জিযিয়া বন্ধ করে দিলে, কোনো মুসলমানকে হত্যা করলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বেয়াদবী করলে অথবা কোনো মুসলিম নারীকে ধর্ষণ করলেও তার নিরাপত্তার গ্যারান্টিযুক্ত নাগরিকত্ব বাতিল হয় না। এসব কাজের জন্য তাকে অপরাধী হিসেবে শাস্তি দেয়া হবে। কিন্তু বিদ্রোহী আখ্যায়িত করে নাগরিকত্বহীন করা হবে না। তবে শুধু দুই অবস্থায় একজন অমুসলিম নাগরিকত্বহীন হয়ে যায়। এক যদি সে মুসলমানদের দেশ ছেড়ে গিয়ে শত্রুদের সাথে মিলিত হয়। দুই যদি সে ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে খোলাখুলি বিদ্রোহে লিপ্ত হয়ে অরাজকতার সৃষ্টি করে [বাদায়ে, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১১৩; ফাতহুল কাদীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৮১-৩৮২]

## পারিবারিক বিষয়াদি

অমুসলিমদের পারিবারিক কর্মকাণ্ড তাদের নিজস্ব পারিবারিক আইন [Personal Law] অনুসারে স্থির করা হবে। এক্ষেত্রে তাদের ওপর ইসলামী আইন কার্যকর হবে না। আমাদের ঘরোয়া জীবনে যেসব জিনিস অবৈধ, তা যদি তাদের ধর্মীয় ও জাতীয় আইনে বৈধ হয়, তাহলে ইসলামী আদালত তাদের আইন অনুসারেই ফায়সালা করবে। উদাহরণ স্বরূপ সাক্ষী ছাড়া বিয়ে, মুহ্র ছাড়া বিয়ে, ইদ্‌তের মধ্যে পুনরায় বিয়ে অথবা ইসলামে যাদের সাথে বিয়ে নিষিদ্ধ তাদের সাথে বিয়ে যদি তাদের আইনে বৈধ থেকে থাকে, তাহলে তাদের জন্য এসব কাজ বৈধ বলে মেনে নেয়া হবে। খোলাফায়ে রাশেদীন এবং তাদের পরবর্তী সকল যুগে ইসলামী সরকারগুলো এই নীতিই অনুসরণ করেছে। হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয এ ব্যাপারে হযরত হাসান বস্‌রীর কাছে নিম্নরূপ প্রশ্ন করেছিলেন :

> "খোলাফায়ে রাশেদীন অমুসলিম নাগরিকদেরকে নিষিদ্ধ মেয়েদের সাথে বিয়ে, মদ ও শূকরের ব্যাপারে স্বাধীন ছেড়ে দিলেন কিভাবে?"

জবাবে হযরত হাসান লিখেছেন :

> "তারা জিযিয়া দিতে তো এজন্যই সম্মত হয়েছে যে, তাদেরকে তাদের আকীদা-বিশ্বাস অনুসারে জীবন যাপন করার স্বাধীনতা দিতে হবে।

আপনার কর্তব্য পূর্ববর্তীদের পদ্ধতি অনুসরণ করা, নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করা নয়।"

তবে কোনো ক্ষেত্রে যদি বিবদমান উভয় পক্ষ স্বয়ং ইসলামী আদালতে আবেদন জানায় যে, ইসলামী শরীয়ত মুতাবিক তাদের বিবাদের ফায়সালা করা হোক, তবে আদালত তাদের ওপর শরীয়তের বিধান কার্যকর করবে। তাছাড়া পারিবারিক আইনের সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো বিবাদে যদি একপক্ষ মুসলমান হয়, তাহলে ইসলামী শরীয়ত মুতাবিক ফায়সালা হবে। উদাহরণ স্বরূপ, একজন খৃষ্টান মহিলা কোনো মুসলমানের স্ত্রী ছিলো এবং তার স্বামী মারা গেলো। এমতাবস্থায় এই মহিলাকে শরীয়ত মুতাবিক স্বামীর মৃত্যুজনিত ইদ্দত পুরোপুরি পালন করতে হবে। ইদ্দতের ভেতের সে বিয়ে করলে সে বিয়ে বাতিল হবে। [আল-মাবসূত, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৮-৪১]

## ধর্মীয় অনুষ্ঠান

অমুসলিমদের ধর্মীয় ও জাতীয় অনুষ্ঠানাদি প্রকাশ্যভাবে ঢাকঢোল পিটিয়ে উদযাপন করা সম্পর্কে ইসলামের বিধান এই যে, অমুসলিমরা তাদের নিজস্ব জনপদে এটা অবাধে করতে পারবে। তবে নির্ভেজাল ইসলামী জনপদগুলোতে ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার ইচ্ছা করলে তাদেরকে এ ব্যাপারে অবাধ স্বাধীনতাও দিতে পারবে, আবার কোনো ধরনের কড়াকড়ি আরোপ করতে চাইলে তাও করতে পারবে।[১] বাদায়ে গ্রন্থে বলা হয়েছে :

"যেসব জনপদ বিধিবদ্ধ ইসলামী জনপদ নয়, সেখানে অমুসলিমদেরকে মদ ও শূকর বিক্রি, ক্রুশ বহন করা ও শঙ্খ ধ্বনি বাজানোতে বাধা দেয়া হবে না। চাই সেখানে মুসলিম অধিবাসীদের সংখ্যা যতোই বেশী হোক না কেনো। তবে বিধিবদ্ধ ইসলামী অঞ্চলে এসব কাজ পছন্দনীয় নয়। অর্থাৎ যেসব জনপদকে জুমুয়া, ঈদ ও ফৌজদারী দণ্ডবিধি প্রচলনের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে।... তবে যে

১. নির্ভেজাল ইসলামী জনপদ শরীয়তের পরিভাষায় "আমসারুল মুসলিমীন" (বিধিবদ্ধ ইসলামী জনপদ) আখ্যায়িত অঞ্চলকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ যেসব অঞ্চলের ভূসম্পত্তি মুসলমানদের মালিকানাভুক্ত এবং যেসব অঞ্চলকে মুসলমানরা ইসলামী অনুষ্ঠানাদি ও উদযাপনের জন্য নির্দিষ্ট করে নিয়েছে।

সমস্ত পাপ কাজকে তারাও নিষিদ্ধ মনে করে, যেমন ব্যভিচার ও অন্যান্য অশ্লীল কাজ, যা তাদের ধর্মেও নিষিদ্ধ সেসব কাজ প্রকাশ্যে করতে তাদেরকে সর্বাবস্থায় বাঁধা দেয়া হবে। চাই সেটা মুসলমানদের জনপদে হোক কিংবা তাদের জনপদে হোক। [বাদায়ে, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১১৩]

কিন্তু বিধিবদ্ধ ইসলামী জনপদগুলোতেও তাদেরকে শুধুমাত্র ক্রুশ ও প্রতিমাবাহী শোভাযাত্রা বের করতে এবং প্রকাশ্যে ঢাকঢোল বাজাতে বাজাতে বের হতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে প্রাচীন উপাসনালয়গুলোর অভ্যন্তরে তারা সকল ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করতে পারবে। ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার তাতে হস্তক্ষেপ করবে না। [শরহু সিয়ারিল কবীর, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৫১]

## উপাসনালয়

নির্ভেজাল মুসলিম জনপদগুলোতে অমুসলিমদের যেসব প্রাচীন উপাসনালয় থাকবে, তাতে হস্তক্ষেপ করা যাবে না। উপাসনালয় যদি ভেংগে যায়, তবে একই জায়গায় পুনর্নির্মাণের অধিকারও তাদের আছে। তবে নতুন উপাসনালয় বানানোর অধিকার নেই। [বাদায়ে, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১১৪; শরহু সিয়রিল কবীর, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৫১]

তবে যেগুলো নির্ভেজাল মুসলিম জনপদ নয়, তাতে অমুসলিমদের নতুন উপাসনালয় নির্মাণের অবাধ অনুমতি রয়েছে। অনুরূপভাবে যেসব এলাকা এখন আর বিধিবদ্ধ ইসলামী জনপদ নেই, সরকার সেখানে জুম্‌য়া, ঈদ ও ফৌজদারী দণ্ডবিধির প্রচলন বন্ধ করে দিয়েছে, সেখানেও অমুসলিমদের নতুন উপাসনালয় নির্মাণ নিজস্ব ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের অধিকার রয়েছে। [বাদায়ে, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১১৪; শরহু সিয়রিল কবীর, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৫৭]

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর ফতোয়া নিম্নরূপ :

"যেসব জনপদকে মুসলমানরা বাসযোগ্য বানিয়েছে, সেখানে অমুসলিমদের নতুন মন্দির, গীর্জা ও উপাসনালয় বানানো, বাদ্য বাজানো এবং প্রকাশ্যে শূকরের গোশত ও মদ বিক্রি করার অধিকার নেই। আর অনারবদের হাতে আবাদকৃত, পরে মুসলমানদের হাতে

বিজিত এবং মুসলমানদের বশ্যতা স্বীকারকারী জনপদে অমুসলিমদের অধিকার তাদের সাথে সম্পাদিত চুক্তির শর্ত অনুসারে চিহ্নিত হবে। মুসলমানরা তা মেনে চলতে বাধ্য থাকবে।"

## জিযিয়া ও কর আদায়ে সুবিধা দান

জিযিয়া ও কর আদায়ে অমুসলিম নাগরিকদের ওপর কঠোরতা প্রয়োগ করা নিষিদ্ধ। তাদের সাথে নম্র ও কোমল ব্যবহার করতে বলা হয়েছে। তারা বহন করতে পারে না এমন বোঝা তাদের ওপর চাপাতে নিষেধ করা হয়েছে। হযরত ওমরের নির্দেশ ছিলো, "যে পরিমাণ সম্পদ রাষ্ট্রকে প্রদান করা তাদের সামর্থের বাইরে তা দিতে তাদেরকে বাধ্য করা চলবে না।" [কিতাবুল খারাজ, পৃষ্ঠা ৮, ৮২]

জিযিয়ার বদলায় তাদের ধন সম্পদ নীলামে চড়ানো যাবে না। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তার জনৈক কর্মচারীকে নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন যে:

> "কর খাজনা বাবদে তাদের গরু, গাধা, কাপড় চোপড় বিক্রি করো না।" [ফাতহুল বায়ান, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯৩]

অপর এক ঘটনায় হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু স্বীয় কর্মচারীকে পাঠানোর সময় বলে দেন : "তাদের শীত গ্রীষ্মের কাপড়, খাবারের উপকরণ ও কৃষি কাজের পশু খাজনা আদায়ের জন্য বিক্রি করবে না, প্রহার করবে না, দাঁড়িয়ে রেখে শাস্তি দেবে না এবং খাজনার বদলায় কোনো জিনিস নিলামে চড়াবে না। কেননা আমরা তাদের শাসক হয়েছি বলে নরম ব্যবহারের মাধ্যমে আদায় করাই আমাদের কাজ। তুমি আমার আদেশ অমান্য করলে আল্লাহ্ আমার পরিবর্তে তোমাকে পাকড়াও করবেন। আর আমি যদি জানতে পারি যে, তুমি আমার আদেশের বিপরীত কাজ করছো, তাহলে আমি তোমাকে পদচ্যুত করবো। [কিতাবুল খারাজ, পৃষ্ঠা ৯]

জিযিয়া আদায়ে যে কোনো ধরনের কঠোরতা প্রয়োগ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু গভর্নর হযরত আবু উবায়দাকে যে ফরমান পাঠিয়েছিলেন তাতে অন্যান্য নির্দেশের পাশাপাশি এ নির্দেশও ছিলো :

"মুসলমানদেরকে অমুসলিমদের ওপর যুলুম করা, কষ্ট দেয়া এবং অন্যায়ভাবে তাদের সম্পত্তি ভোগ দখল করা থেকে বিরত রাখো।" [কিতাবুল খারাজ, পৃষ্ঠা ৮২]

সিরিয়া সফরকালে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু দেখলেন, সরকারী কর্মচারীরা জিযিয়া আদায় করার জন্য অমুসলিম নাগরিকদের শাস্তি দিচ্ছে। তিনি তাদের বললেন, "ওদের কষ্ট দিও না। তোমরা যদি ওদের কষ্ট দাও তবে আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন তোমাদের শাস্তি দেবেন।" [কিতাবুল খারাজ, পৃষ্ঠা ৭১]

হিশাম ইবনে হাকাম দেখলেন, জনৈক সরকারী কর্মচারী জিযিয়া আদায় করার জন্য জনৈক কিবতীকে রোদে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। তিনি তাকে তিরস্কার করলেন এবং বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি :

"যারা দুনিয়ায় মানুষকে শাস্তি দেবে, আল্লাহ্ তাদেরকে শাস্তি দেবেন।" [আবু দাউদ]

মুসলিম ফিক্হ্ শাস্ত্রকারগণ জিযিয়া দেয়া অস্বীকারকারীদের বড়জোর বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেয়ার অনুমতি দিয়েছেন। ইমাম আবু ইউসুফ বলেন,

"তবে তাদের সাথে সদয় আচরণ করা হবে এবং প্রাপ্য জিযিয়া না দেয়া পর্যন্ত আটক করে রাখা হবে।" [কিতাবুল খারাজ, পৃষ্ঠা ৭০]

যেসব অমুসলিম নাগরিক দারিদ্র্যের শিকার ও পরমুখাপেক্ষী হয়ে যায়, তাদের জিযিয়া তো মাফ করা হবেই, উপরন্তু ইসলামী কোষাগার থেকে তাদের জন্য নিয়মিত সাহায্যও বরাদ্দ করা হবে। হযরত খালিদ হীরাবাসীদের যে লিখিত নিরাপত্তা সনদ দিয়েছিলেন, তাতে একথাও লেখা ছিলো :

"আমি হীরাবাসী অমুসলিমদের জন্য এ অধিকারও সংরক্ষণ করলাম যে, তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বার্ধক্যের দরুন কর্মক্ষমতা হারিয়ে বসেছে, যার ওপর কোনো দুর্যোগ নেমে এসেছে অথবা যে পূর্বে ধনী ছিলো, পরে দরিদ্র হয়ে গেছে, ফলে তার স্বধর্মের লোকেরাই তাকে দান-দক্ষিণা দিতে শুরু করেছে, তার জিযিয়া মাফ করে দেয়া হবে এবং তাকে ও তার পরিবার-

পরিজন ও সন্তানদের বাইতুলমাল থেকে ভরণপোষণ করা হবে।" [কিতাবুল খারাজ, পৃষ্ঠা ৮৫]

একবার হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু জনৈক বৃদ্ধ লোককে ভিক্ষা করতে দেখে তার কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে বললো, "কী আর করবো বাপু, জিযিয়া দেয়ার জন্য ভিক্ষে করছি।" এ কথা শুনে তিনি তৎক্ষণাৎ তার জিযিয়া মাফ ও তার ভরণপোষণের মাসিক বৃত্তি নির্ধারণ করে দিলেন। তিনি কোষাগারের কর্মকর্তাকে লিখলেন, "আল্লাহ্র কসম! এটা কখনো ইনসাফ নয় যে, আমরা যৌবনে তার দ্বারা উপকৃত হবো, আর বার্ধক্যে তাকে অপমান করবো।" [কিতাবুল খারাজ, পৃষ্ঠা ৭২; ফাতহুল কাদীর, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৭৩]

দামেস্ক সফরের সময়ও হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু অক্ষম অমুসলিম নাগরিকদের জন্য বৃত্তি নির্ধারণ করার আদেশ জারী করেছিলেন। [বালাযুরী, ফুতূহুল বুলদান, পৃষ্ঠা ১২৯]

কোনো অমুসলিম নাগরিক মারা গেলে তার কাছে প্রাপ্য বকেয়া জিযিয়া তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে আদায় করা হবে না এবং তার উত্তরাধিকারীদের ওপরও এর দায়ভার চাপানো হবে না। ইমাম আবু ইউসুফ বলেন :

"কোনো অমুসলিম নাগরিক তার কাছে প্রাপ্য জিযিয়া পুরো অথবা আংশিক দেয়ার আগেই মারা গেলে তা তার উত্তরাধিকারীদের কাছ থেকে বা তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে আদায় করা হবে না।" [কিতাবুল খারাজ, পৃষ্ঠা ৭০; আল-মাবসূত, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮১]

## বাণিজ্য কর

মুসলিম ব্যবসায়ীদের মতো অমুসলিম ব্যবসায়ীদেরও বাণিজ্য পণ্যের ওপর কর আরোপ করা হবে যদি তাদের মূলধন ২০০ দিরহাম পর্যন্ত পৌঁছে অথবা তারা ২০ মিসকাল স্বর্ণের মালিক হয়ে যায়।[১] এ কথা সত্য যে, ফিকাহ শাস্ত্রকারগণ অমুসলিম ব্যবসায়ীদের ওপর বাণিজ্যের শতকরা ৫ ভাগ এবং

১. কিতাবুল খারাজ, পৃ. ৭০। তবে আজও কর আরোপের জন্য অবিকল এই পরিমাণ নিসাব নির্ধারণ করা জরুরী নয়। এটা সেই সময়কার অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নির্ধারিত হয়েছিল।

মুসলিম ব্যবসায়ীদের ওপর আড়াই ভাগ আরোপ করেছিলেন। তবে এ কাজটা কুরআন বা হাদীসের কোনো সুস্পষ্ট বাণীর আলোকে করা হয়নি। এটা তাদের ইজতিহাদ বা গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্ত ছিলো। এটা সমকালীন পরিস্থিতির চাহিদা অনুসারে করা হয়েছিল। সে সময় মুসলমানগণের অধিকাংশই দেশ রক্ষার কাজে নিয়োজিত ছিলেন এবং সমস্ত ব্যবসায় বাণিজ্য অমুসলিমদের হাতে চলে গিয়েছিল। এজন্য মুসলিম ব্যবসায়ীদের উৎসাহ বৃদ্ধি এবং তাদের ব্যবসায়ের সংরক্ষণের জন্য তাদের ওপর কর কমিয়ে দেয়া হয়েছে।

## সামরিক চাকুরী থেকে অব্যাহতি

অমুসলিমগণ সামরিক দায়িত্বমুক্ত। শত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করা এককভাবে শুধু মুসলমানদের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। কারণ একটা আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্রের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কেবল তারাই উপযুক্ত বিবেচিত হতে পারে, যারা ঐ আদর্শকে সঠিক বলে মানে। তাছাড়া লড়াইতে নিজেদের আদর্শ ও মূলনীতি মেনে চলাও তাদের পক্ষেই সম্ভব। অন্যেরা দেশ রক্ষার জন্য লড়াই করলে ভাড়াটে সৈন্যের মতো লড়বে এবং ইসলামের নির্ধারিত নৈতিক সীমা রক্ষা করে চলতে পারবে না। এজন্য ইসলাম অমুসলিমদের সামরিক দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়েছে এবং কেবলমাত্র দেশ রক্ষার কাজের ব্যয় নির্বাহে নিজেদের অংশ প্রদানকে তাদের কর্তব্য বলে চিহ্নিত করেছে। এটাই শুধু যে আনুগত্যের প্রতীক তা নয় বরং সামরিক কর্মকাণ্ড থেকে অব্যাহতি লাভ ও দেশ রক্ষার বিনিময়ও বটে। এজন্য জিযিয়া শুধুমাত্র যুদ্ধ করতে সক্ষম পুরুষদের ওপরই আরোপ করা হয়। আর কখনো যদি মুসলমানরা অমুসলিমদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অক্ষম হয়, তাহলে জিযিয়ার টাকা ফেরত দেয়া হয়।[১] ইয়ারমুকের

১. এ বিষয়ে বিস্তারিত অধ্যয়নের জন্য দেখুন আল-মাবসূত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৭৮-৭৯; হিদায়া, কিতাবুস সিয়ার; ফাতহুল কাদীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩২৭-৩২৮ এবং ৩৬৯-৩৭০। কোনো বহিশত্রুর আক্রমণের সময় দেশের অমুসলিম নাগরিকরা যদি দেশ রক্ষার কাজে অংশগ্রহণ করার আগ্রহ প্রকাশ করে, তবে আমরা তাদেরকে অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে পারি। তবে সে ক্ষেত্রে তাদের জিযিয়া রহিত করতে হবে। উল্লেখ্য যে, জিযিয়ার নাম শুনতেই অমুসলিমদের মনে যে আতংক জন্মে,

যুদ্ধে যখন রোমকরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিশাল সমাবেশ ঘটালো এবং মুসলমানরা সিরিয়ার সকল বিজিত এলাকা পরিত্যাগ করে একটি কেন্দ্রে নিজেদের শক্তি কেন্দ্রীভূত করতে বাধ্য হলো, তখন হযরত আবু উবাইদা নিজের অধীনস্থ সেনাপতিদের নির্দেশ দিলেন, তোমরা যেসব জিযিয়া ও খাজনা অমুসলিমদের কাছ থেকে আদায় করেছিলে তা তাদের ফিরিয়ে দাও এবং বলো যে, "এখন আমরা তোমাদের রক্ষা করতে অক্ষম, তাই যে অর্থ তোমাদের রক্ষা করার বিনিময়ে আদায় করেছিলাম তা ফেরত দিচ্ছি"। [কিতাবুল খারাজ, পৃষ্ঠা ১১১]

এই নির্দেশ মুতাবিক সকল সেনাপতি আদায় করা অর্থ ফেরত দিলেন। এ সময় অমুসলিম নাগরিকদের প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করে ঐতিহাসিক বালাযুরী লিখেছেন, মুসলমান সেনাপতিগণ যখন সিরিয়ার হিম্‌স নগরীতে জিযিয়ার অর্থ ফেরত দেন, তখন সেখানকার অধিবাসীবৃন্দ সমস্বরে বলে ওঠে, "ইতিপূর্বে যে যুলুম অত্যাচারে আমরা নিষ্পেষিত হচ্ছিলাম, তার তুলনায় তোমাদের শাসন ও ন্যায়বিচারকে আমরা বেশী পছন্দ করি। এখন আমরা যুদ্ধ করে পরাজিত হওয়া ছাড়া কোনো মতেই হিরাক্লিয়াসের কর্মচারীদেরকে আমাদের শহরে ঢুকতে দেবো না।" [ফুতূহুল বুলদান, পৃষ্ঠা ১৩৭]

## ৩. মুসলিম ফকীহদের সমর্থন

হিজরী প্রথম শতাব্দীতে অমুসলিম নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে যে আইন প্রণীত হয়েছিল, ওপরের আলোচনায় তার কিছু বিশদ বিবরণ দেয়া হলো। পরবর্তী আলোচনায় পরবর্তী রাজতন্ত্রের যুগে যখনই অমুসলিমদের সাথে অবিচার করা হয়েছে, তখন মুসলিম ফকীহগণ সর্বাগ্রে মযলুম অমুসলিমদের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন এবং ঐক্যবদ্ধভাবে তাদের

---

সেটা শুধু মাত্র ইসলামের শত্রুদের দীর্ঘকাল ব্যাপী অপপ্রচারের ফল। অন্যথায় এই আতংকের কোনো ভিত্তি নেই। জিযিয়া মূলতঃ ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমরা যে নিরাপদ ও সুরক্ষিত জীবন যাপনের সুযোগ পায় তারই বিনিময়। শুধু মাত্র সক্ষম ও প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষদের কাছ থেকে এটা নেয়া হয়। এটাকে যদি ইসলাম গ্রহণ না করার জরিমানা বলা হয়, তাহলে যাকাতকে কি বলা হবে ? যাকাত তো শুধু প্রত্যেক সক্ষম পুরুষই নয় বরং সক্ষম নারীর কাছ থেকেও আদায় করা হয়। ওটা কি তাহলে ইসলাম গ্রহণের জরিমানা ?

পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছেন। ইতিহাসের প্রসিদ্ধ ঘটনা যে, উমাইয়া শাসক ওলীদ বিন আবদুল মালেক দামেস্কের ইউহান্না গীর্জাকে জোরপূর্বক খৃষ্টানদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে মসজিদের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিলেন। হযরত ওমর বিন আবদুল আযীয ক্ষমতায় এলে খৃষ্টানরা এ ব্যাপারে তাঁর কাছে অভিযোগ দায়ের করলো। তিনি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে লিখে পাঠালেন, মসজিদের যেটুকুই অংশ গীর্জার জায়গার ওপর নির্মাণ করা হয়েছে তা ভেংগে খৃষ্টানদের হাতে সোপর্দ করে দাও।"

ওলীদ বিন ইয়াযীদ রোমক আক্রমণের ভয়ে সাইপ্রাসের অমুসলিম অধিবাসীদের দেশ থেকে বহিষ্কার করে সিরিয়ায় পুনর্বাসিত করেন। এতে মুসলিম ফকীহগণ ও সাধারণ মুসলমানরা ভীষণভাবে বিক্ষুব্ধ হন এবং তারা একে একটা মস্তবড় গুনাহর কাজ বলে আখ্যায়িত করেন। এরপর যখন ওলীদ বিন ইয়াযীদ পুনরায় তাদের সাইপ্রাসে নিয়ে পুনর্বাসিত করলেন, তখন তার প্রশংসা করা হয় এবং বলা হয়, এটাই ইনসাফের দাবী। ইসমাঈল বিন আইয়াশ বলেন :

> "মুসলমানরা তার এ কাজে কঠোর অসন্তোষ প্রকাশ করে এবং ফকীহগণ একে গুনাহর কাজ মনে করেন। অতঃপর যখন ইয়াযীদ খলীফা হলেন এবং তাদের আবার সাইপ্রাসে ফেরত পাঠালেন। তখন মুসলমানরা এ কাজ পছন্দ করেন এবং একে ন্যায়বিচার আখ্যায়িত করেন।' [ফুতূহুল বুলদান, পৃষ্ঠা ১৫৬]

ঐতিহাসিক বালাযুরী বর্ণনা করেন, একবার লেবাননের পার্বত্য এলাকার অধিবাসীদের মধ্য থেকে একটি গোষ্ঠী সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। সালেহ বিন আবদুল্লাহ তাদের দমন করার জন্য একটি সেনাদল পাঠান এই সেনাদল উক্ত বিদ্রোহী গোষ্ঠীর সকল সশস্ত্র পুরুষদের হত্যা করে এবং বাদবাকীদের একদলকে দেশান্তরিত করে ও অপর দলকে যথাস্থানে বহাল রাখে। ইমাম আওযায়ী তখন জীবিত ছিলেন। তিনি সালেহকে এই যুলুমের জন্য তিরস্কার করেন এবং একটা দীর্ঘ পত্র লেখেন। পত্রটির অংশ বিশেষ নিম্নে দেয়া হলো :

> "লেবানন পর্বতের অধিবাসীদের বহিষ্কারের ঘটনাটা তোমার অজানা নয়। তাদের ভেতরে এমনও অনেকে আছে, যারা বিদ্রোহীদের সাথে

মোটেই অংশ গ্রহণ করেনি। তথাপি তুমি তাদের কতককে হত্যা করলে এবং কতককে তাদের বাসস্থানে ফেরত পাঠিয়ে দিলে। আমি বুঝি না, কতিপয় বিশেষ অপরাধীর অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের শাস্তি সাধারণ মানুষকে কিভাবে দেয়া যায় এবং তাদের সহায় সম্পত্তি থেকে তাদের কিভাবে উৎখাত করা যায়? অথচ আল্লাহ্‌র সুস্পষ্ট নির্দেশ এই যে, "একজনের পাপের বোঝা আরেকজন বহন করবে না।" এটা একটা অবশ্য করণীয় নির্দেশ। তোমার জন্য আমার সর্বোত্তম উপদেশ হলো, তুমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই কথাটা মনে রেখো যে, "যে ব্যক্তি কোনো চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম নাগরিকের ওপর যুলুম করবে এবং তাদের সামর্থের চেয়ে বেশী তার ওপর বোঝা চাপাবে, তার বিরুদ্ধে আমি নিজেই ফরিয়াদী হবো।" [ফুতূহুল বুলদান, পৃষ্ঠা ১৬৯]

ইতিহাসে এ ধরনের অসংখ্য দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এ সব দৃষ্টান্ত থেকে বুঝা যায় যে, মুসলিম আলেম সমাজ চিরদিনই অমুসলিমদের অধিকার সংরক্ষণে সোচ্চার থেকেছেন। কখনো কোনো রাজা বা শাসক তাদের ওপর যুলুম ও বাড়াবাড়ি যদি করে থাকে, তবে তৎকালে ইসলামী আইনের যেসব রক্ষক বেঁচে ছিলেন, তারা কখনো সেই যালিমকে তিরস্কার না করে ছাড়েননি।

## ৪. অমুসলিমদের যে সব বাড়তি অধিকার দেয়া যায়

উপরে আমরা অমুসলিমদের যে সব অধিকারের উল্লেখ করেছি, সেগুলো তাদের জন্য শরীয়তে সুনির্দিষ্ট এবং সেগুলো যে কোনো ইসলামী শাসনতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত।

এক্ষণে আমি সংক্ষেপে বলবো যে, বর্তমান যুগে একটি ইসলামী রাষ্ট্র তার অমুসলিম নাগরিকদেরকে ইসলামী মূলনীতির আলোকে কি কি অতিরিক্ত অধিকার দিতে পারে।

### রাষ্ট্র প্রধানের পদ

সর্ব প্রথম রাষ্ট্র প্রধানের প্রশ্নে আসা যাক। যেহেতু ইসলামী রাষ্ট্র একটা আদর্শবাদী রাষ্ট্র, তাই ধর্মহীন জাতীয় প্রজাতন্ত্রগুলো সংখ্যালঘুদের ভোটাধিকার সম্পর্কে যে প্রতারণার আশ্রয় নেয়, ইসলামী রাষ্ট্র তার আশ্রয়

নিতে পারে না। ইসলামে রাষ্ট্র প্রধানের দায়িত্ব হলো ইসলামের মূলনীতি অনুসারে রাষ্ট্র পরিচালনা করা। সুতরাং যারা ইসলামের মূলনীতিকেই মানে না, সে আর যাই হোক রাষ্ট্র প্রধানের পদে কোনোক্রমেই অভিষিক্ত হতে পারে না।

## মজলিশে শূরা বা আইন সভা

এরপর আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে মজলিশে শূরা বা পার্লামেন্ট তথা আইন সভা। এই আইন সভাকে যদি শতকরা একশো ভাগ খাঁটি ও নির্ভেজাল ইসলামী আদর্শ মুতাবিক গঠন করতে হয়, তাহলে এখানেও অমুসলিম প্রতিনিধিত্ব শুদ্ধ নয়। তবে বর্তমান যুগের পরিস্থিতির আলোকে এর অবকাশ এই শর্তে সৃষ্টি করা যেতে পারে যে, দেশের সংবিধানে এই মর্মে সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন নিশ্চয়তা দিতে হবে যে :

ক. আইন সভা কুরআন ও সুন্নাহ বিরোধী কোনো আইন প্রণয়ন করতে পারবে না এবং এই সীমা লংঘনকারী যে কোনো সিদ্ধান্ত আইনের সমর্থন থেকে বঞ্চিত হবে।

খ. দেশের আইনের সর্বপ্রধান উৎস হবে কুরআন ও সুন্নাহ।

গ. আইনের চূড়ান্ত অনুমোদনের কাজটি যে ব্যক্তি করবেন তিনি মুসলমান হবেন।

এরূপ একটি পদ্ধতিও অবলম্বন করা যেতে পারে যে, অমুসলিমদেরকে দেশের আইন সভার অন্তর্ভুক্ত করার পরিবর্তে তাদের জন্য একটা আলাদা প্রতিনিধি পরিষদ বা আইন সভা গঠন করে দেয়া হবে। এই পরিষদ দ্বারা তারা নিজেদের সামষ্টিক প্রয়োজনও মেটাতে পারবে এবং দেশের প্রশাসন সংক্রান্ত ব্যাপারেও নিজেদের দৃষ্টিভংগি তুলে ধরতে পারবে। এই পরিষদের সদস্যপদ এবং ভোটাধিকার শুধুমাত্র অমুসলিমদের জন্য নির্দিষ্ট থাকবে এবং এখানে তাদের মতামত প্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে। এই পরিষদের মাধ্যমে তারা নিম্নলিখিত কাজগুলো সমাধা করতে পারবে।

১. তারা নিজেদের পারিবারিক ও ধর্মীয় বিষয়ে আইন প্রণয়ন ও আগে থেকে প্রচলিত সকল আইনের খসড়া রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমোদনক্রমে আইনে পরিণত করতে পারবে।

২. তারা সরকারের প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড ও মজলিশে শূরার সিদ্ধান্তসমূহ সম্পর্কে নিজেদের অভিযোগ, পরামর্শ ও প্রস্তাব অবাধে পেশ করতে পারবে এবং সরকার ইনসাফ সহকারে তার পর্যালোচনা করবে।

৩. তারা আপন সম্প্রদায়ের স্বার্থ ও দেশের অন্যান্য ব্যাপারে প্রশ্নও করতে পারবে। সরকারের একজন প্রতিনিধি তাদের প্রশ্নের জবাব দেয়ার জন্যও উপস্থিত থাকবে।

উপরোক্ত তিনটি পন্থার যে কোনো একটি পরিস্থিতি ও প্রয়োজন অনুসারে গ্রহণ করা যেতে পারে।

পৌরসভা ও স্থানীয় সরকারের স্তরগুলোতে [Local Bodies] অমুসলিমদের প্রতিনিধিত্ব ও ভোট দানের পূর্ণ অধিকার দেয়া যেতে পারে।

## বাক স্বাধীনতা, লেখার স্বাধীনতা ইত্যাদি

ইসলামী রাষ্ট্রে একজন মুসলমান যেমন বাক স্বাধীনতা, লেখার স্বাধীনতা, সমাবেশ ও সংগঠনের স্বাধীনতা এবং মতামত ও বিবেকের স্বাধীনতা ভোগ করে, অমুসলিমরাও অবিকল সেরূপ স্বাধীনতা ভোগ করবে। এ ব্যাপারে যেসব আইনগত বিধি নিষেধ মুসলমানদের ওপর থাকবে, তা তাদের ওপরও থাকবে।

আইন সংগতভাবে তারা সরকার, সরকারী আমলা এবং স্বয়ং সরকার প্রধানেরও সমালোচনা করতে পারবে।

তারা নিজেদের ধর্ম প্রচারের স্বাধীনতা ভোগ করবে এবং একজন অমুসলিম যে কোনো ধর্ম গ্রহণ করলে তাতে সরকারের কোনো আপত্তি থাকবে না। তবে কোনো মুসলমান ইসলামী রাষ্ট্রের চৌহদ্দীতে থাকা অবস্থায় আপন ধর্ম পরিবর্তন করতে পারবে না। তবে এরূপ ধর্মত্যাগী মুসলমানকে আপন ধর্ম ত্যাগের ব্যাপারে যে জবাবদিহীর সম্মুখীন হতে হবে, সেটা তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। যে অমুসলিম দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সে ইসলাম ত্যাগ করেছে, তাকে এজন্য আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে না।

তাদেরকে তাদের বিবেকের বিরুদ্ধে কোনো চিন্তা ও কর্ম অবলম্বনে বাধ্য

করা যাবে না। দেশের প্রচলিত আইনের বিরোধী নয় এমন যে কোনো কাজ তারা আপন বিবেকের দাবী অনুসারে করতে পারবে।

## শিক্ষা

ইসলামী রাষ্ট্রে গোটা দেশের জন্য যে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করবে, তাদেরকে সেই শিক্ষা ব্যবস্থাই গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু ইসলামের ধর্মীয় পুস্তকাদি পড়তে তাদেরকে বাধ্য করা যাবে না। দেশের সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অথবা নিজেদের বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আপন ধর্ম শিক্ষার আলাদা ব্যবস্থা করার পূর্ণ স্বাধীনতা তাদের থাকবে।

## চাকুরী

কতিপয় সংরক্ষিত পদ ছাড়া সকল চাকুরীতে তাদের প্রবেশাধিকার থাকবে এবং এ ব্যাপারে তাদের সাথে কোনো বৈষম্য করা চলবে না। মুসলিম ও অমুসলিম উভয়ের যোগ্যতার একই মাপকাঠি হবে এবং যোগ্য লোকদেরকে ধর্মীয় পরিচয় নির্বিশেষে নির্বাচন করা হবে।

সংরক্ষিত পদসমূহ বলতে ইসলামের আদর্শগত ব্যবস্থায় মৌলিক গুরুত্বসম্পন্ন পদসমূহকে বুঝানো হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের একটি দলের যথেষ্ট চিন্তা ভাবনার পর এই পদগুলোর তালিকা তৈরী করা যেতে পারে। আমি একটা দিক নির্দেশক মূলনীতি হিসেবে শুধু এই কথা বলতে পারি যে, যেসব পদ নীতি নির্ধারণ ও বিভিন্ন বিভাগের দিক নির্দেশনার সাথে জড়িত, সেগুলো মৌলিক গুরুত্বসম্পন্ন পদ। একটা আদর্শবাদী রাষ্ট্রে ব্যবস্থায় এইসব পদ কেবল সংশ্লিষ্ট আদর্শে বিশ্বাসীদেরকেই দেয়া যেতে পারে। এই পদগুলো বাদ দেয়ার পর বাদবাকী সমগ্র প্রশাসনের বড় বড় পদেও যোগ্যতা সাপেক্ষে অমুসলিমদেরকে নিয়োগ করা যেতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, রাষ্ট্রের মহা হিসাব রক্ষক, মহা প্রকৌশলী কিংবা পোস্ট মাস্টার জেনারেলের ন্যায় পদে সুযোগ্য অমুসলিম ব্যক্তিদের নিয়োগে কোনো বাঁধা নেই।

অনুরূপভাবে সেনাবাহিনীতেও শুধুমাত্র প্রত্যক্ষ যুদ্ধ সংক্রান্ত দায়িত্ব সংরক্ষিত দায়িত্ব বলে গণ্য হবে। এ ছাড়া অন্যান্য সামরিক বিভাগ যার

কোনো সম্পর্ক সরাসরি যুদ্ধের সাথে নেই, অমুসলিমদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

## অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও পেশা

শিল্প, কারিগরি, বাণিজ্য, কৃষি ও অন্য সকল পেশার দুয়ার অমুসলিমদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। এসব ক্ষেত্রে মুসলমানরা যে সুযোগ সুবিধা ভোগ করে থাকে, তা অমুসলমানরাও ভোগ করবে এবং মুসলমানদের ওপর আরোপ করা হয় না এমন কোনো বিধি নিষেধ অমুসলিমদের ওপরও আরোপ করা যাবে না। মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে প্রত্যেক নাগরিকের অর্থনৈতিক ময়দানে তৎপরতা চালানোর সমান অধিকার থাকবে।

## অমুসলিমদের নিরাপত্তার একমাত্র উপায়

একটি ইসলামী রাষ্ট্র তার অমুসলিম নাগরিকদের যে অধিকারই দেবে, তা পার্শ্ববর্তী কোন্ অমুসলিম রাষ্ট্র ত্যর মুসলিম নাগরিকদেরকে কি কি অধিকার দিয়ে থাকে, বা আদৌ দেয় না, তার পরোয়া না করেই দেবে। আমরা একথা মানি না যে, মুসলমানরা অমুসলিমদের দেখাদেখি আপন কর্মপন্থা নির্ণয় করবে। তারা ইনসাফ করলে এরাও ইনসাফ করবে আর তারা যুলুম করলে এরাও যুলুম করবে, এটা হতে পারে না। আমরা মুসলমান হিসেবে একটা সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট নীতি ও আদর্শের অনুসারী। আমাদের যতোদূর সাধ্যে কুলায়, নিজস্ব নীতি ও আদর্শ অনুসারেই কাজ করতে হবে। আমরা যা দেবো তা আন্তরিকতা ও সদুদ্দেশ্য নিয়েই দেবো এবং তা শুধু কাগজে কলমে নয় বরং বাস্তবেই দেবো। যে দায়িত্ব আমরা গ্রহণ করবো তা পূর্ণ ইনসাফ ও সততার সাথে পালন করবো।

এরপর একথা আর বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না যে, মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে অমুসলিমদের নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধির সবচেয়ে বড় নিশ্চয়তা এই রাষ্ট্রগুলোকে পরিপূর্ণ ও নির্ভেজাল ইসলামী রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করা ছাড়া আর কোনোভাবে দেয়া সম্ভব নয়। দুর্ভাগ্য বশত গোটা এই উপমহাদেশ জুড়ে যুলুম ও নিপীড়নের যে পৈশাচিক বিভীষিকা চলছে, তাকে প্রশমিত করার এটাই একমাত্র অব্যর্থ উপায়। শুধুমাত্র এই পন্থা অবলম্বনেই পাকিস্তানও হতে

পারে ইনসাফের আবাসভূমি আর ভারত এবং অন্যান্য দেশও ইনসাফের পথ খুঁজে পেতে পারে। পরিতাপের বিষয় হলো, অমুসলিমরা দীর্ঘ কালব্যাপী ইসলামের কেবল অপব্যাখ্যাই শুনে ও দেখে আসছে। তাই তারা ইসলামী রাষ্ট্র ও ইসলামী শাসনের কথা শুনলেই আতংকিত হয়। আর তাদের কেউ কেউ দাবী জানাতে থাকে যে, আমাদের এখানেও ভারতের ন্যায় ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র কায়েম হওয়া উচিত। বাস্তবিক পক্ষে ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রে কি এমন কোনো আনন্দময় পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, যার প্রত্যাশা করা যেতে পারে ? তার পরিবর্তে এমন একটি ব্যবস্থার পরীক্ষা করা কি ভালো নয় যার ভিত্তি খোদাভীতি, সততা এবং শাশ্বত সুন্দর আদর্শের অনুসরণের ওপর প্রতিষ্ঠিত ? [তরজমানুল কুরআন : আগস্ট ১৯৪৮ ঈসায়ী]

## অমুসলিমদের অধিকার

[জনাব নঈম সিদ্দিকী মাওলানা মওদূদী (র)-এর গ্রন্থাবলীর আলোকে ইসলামী সংবিধানের রূপরেখা নামে একটি পুস্তিকা রচনা করেছেন। পুস্তিকায় যেসব ধারা উল্লেখ করেছেন তা থেকে সংশ্লিষ্ট কয়েকটি ধারা এখানে উল্লেখ করা হলো]

### ধারা-১৫

যে ব্যক্তি এই রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব, রাষ্ট্রীয় আদর্শ ও উদ্দেশ্যের সাথে পূর্ণ একমত পোষণ করবে না, এ রাষ্ট্রের সীমানায় সে অমুসলিম বলে গণ্য হবে। সে রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের আইন কানুন মেনে নিয়ে অমুসলিম নাগরিক হিসেবে এ রাষ্ট্রে বসবাস করতে পারবে।

### ধারা-১৬

ইসলামী রাষ্ট্র অমুসলিমদেরকে মৌলিক মানবাধিকার এবং সাধারণ অধিকার ছাড়াও সেই সব অধিকার প্রদান করবে যা ইসলামী শরীয়া তাদের জন্যে নির্ধারণ করে দিয়েছে। শরীয়ত প্রদত্ত এসব অধিকার হরণ করার কিংবা কম বেশি করার ক্ষমতা কারো নেই। তবে সরকার সংগত মনে করলে নির্দিষ্ট অধিকারের চাইতে অতিরিক্ত কিছু অধিকার তাদের দিতে পারে, যদি তা ইসলামী শরীয়ার সাথে সাংঘর্ষিক না হয়।

### ধারা-১৭

যখন কোনো অমুসিলম সাংবিধানিকভাবে অমুসলিমের অধিকার লাভ করবে অথবা অমুসলিমের অধিকার তাকে দেয়া হবে তখন এই অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করা যাবে না। তবে সে নিজেই যদি নিজেকে সেই অধিকার থেকে মুক্ত ঘোষণা করে কিংবা সুস্পষ্ট গাদ্দারির মাধ্যমে রাষ্ট্রের আনুগত্য পরিহার করে, সেটা ভিন্ন কথা।

ধারা-১৮

ক. মৌলিক মানবাধিকার ও সাধারণ অধিকারের ক্ষেত্রে মুসলিম অমুসলিমদের মধ্যে সমতা রক্ষা করা হবে।

খ. ফৌজদারী ও দেওয়ানী আইনের ক্ষেত্রেও মুসলমান ও অমুসলমানদের মধ্যে পূর্ণ সমতা রক্ষা করা হবে।

গ. মুসলমানদের যেসব আবাসিক এলাকায় নিজেদের ধর্মীয় নিদর্শনাবলী সংরক্ষিত আছে সেসব এলাকা ছাড়া দেশের সর্বত্র অমুসলিমরা তাদের ধর্মীয় ইমারত নির্মাণ এবং অনুষ্ঠান পালনের অধিকার লাভ করবে।

ঘ. অমুসলিমরা তাদের স্বধর্মের লোকদেরকে এবং শিশুদেরকে তাদের ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করার অধিকার লাভ করবে এবং অমুসলিম আবাসিক এলাকায় নিজেদের ধর্ম প্রচার করতে পারবে। তাছাড়া আইনের সীমার মধ্যে থেকে নিজেদের ধর্মের সৌন্দর্য প্রকাশ এবং ইসলামের সমালোচনা করতে পারবে।

ঙ. অমুসমিলদের পার্সোনাল বিষয়াদি তাদের পার্সোনাল 'ল' অনুযায়ী সম্পন্ন হবে। ইসলামী আইন তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হবে না। তবে তারাই যদি তা দাবি করে সেটা ভিন্ন কথা। অবশ্য কোনো বিষয়ে মুসলমান ও অমুসলমানদের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে সেটা সমাধান হবে রাষ্ট্রীয় আইনে।

চ. নীতিগতভাবে অমুসলিমদের উপর রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব চাপানো হবে না, তবে তাদের কেউ যদি স্বেচ্ছায় এ দায়িত্ব পালনের জন্যে নিজেকে পেশ করে তবে সেটা ভিন্ন কথা। এ ক্ষেত্রে তাদের থেকে প্রতিরক্ষা ব্যয়ের ট্যাক্স আদায় করা হবে। তবে এই ট্যাক্স শুধু যুদ্ধ করার যোগ্য পুরুষদের উপরই আরোপ করা হবে। নারী, শিশু, বৃদ্ধ, বৈরাগী ও পঙ্গুদের উপর এই ট্যাক্স আরোপ করা হবে না। এ ছাড়া যারা রাষ্ট্রীয় কোনো সেবায় নিযুক্ত থাকবে তাদের উপরও আরোপ করা হবে না।

**ধারা-১৯**

সংবিধানের আওতায় অমুসলিমরা ইসলামী রাষ্ট্রে সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা (cultural) লাভ করবে। এ উদ্দেশ্যে তারা নিজেদের মধ্যে নির্বাচনের মাধ্যমে একটি প্রতিনিধিত্বমূলক এ্যাসেম্বলী গঠন করবে যার দায়িত্ব ও কর্তব্য হবে :

ক. অমুসলিমদের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের তত্ত্বাবধান।

খ. অমুসলিমদের দাবি-দাওয়া এবং অভিযোগ ও সমস্যাসমূহ সরকারের কাছে উপস্থাপন করা।

গ. সরকারে ত্রুটি বিচ্যুতি সমালোচনা করা এবং রাষ্ট্রীয় সমস্যাবলীর ব্যাপারে নিজেদের মতামত প্রকাশ করা।

ঘ. অমুসলিমদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সমস্যাবলী এবং তাদের পার্সোনাল 'ল' সম্পর্কে আইনগত সুপারিশ তৈরি করা এবং পার্লামেন্টে পেশ করা। পার্লামেন্টে অনুমোদনের পরই তা আইন হিসেবে পরিগণিত হবে।

# নাগরিকত্ব ও তার ভিত্তি

এখন নাগরিকত্বের বিষয়টি সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। ইসলাম যেহেতু চিন্তা ও কর্মের একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা এবং এই ব্যবস্থার ভিত্তিতে সে একটি রাষ্ট্রও কায়েম করে। তাই ইসলাম তার রাষ্ট্রের নাগরিকত্বকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করে। উপরন্তু সততা ও ন্যায় পরায়ণতা যেহেতু ইসলামের মূল প্রাণসত্তা, তাই কোনো প্রকার ধোঁকা বা প্রতারণা ব্যতিরেকেই সে নাগরিকত্বের এই দুই শ্রেণীকে সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করেছে। মুখে মুখে সকল নাগরিককে সমান মর্যাদা দানের কথা বলে এবং কার্যত তাদের মধ্যে কেবল পার্থক্য করেই নয় বরং তাদের বিরাট অংশকে মানবীয় অধিকার দিতে কুণ্ঠিত হওয়ার মতো মারাত্মক প্রতারণা কিছুতেই ইসলাম করতে পারে না। যেমন আমেরিকায় নিগ্রোদের, রাশিয়ায় অ-কমিউনিষ্টদের এবং দুনিয়ার সমস্ত ধর্মহীন গণতন্ত্রের [Secular Democracy] রাষ্ট্রে দেশের সংখ্যালঘুদের মানবাধিকার বর্জিত দুরাবস্থার কথা দুনিয়ার কার না জানা আছে?

ইসলাম নাগরিকদের নিম্নোক্ত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেছে :

১. মুসলিম।

২. জিম্মী [অমুসলিম]।

মুসলিম নাগরিকদের সম্পর্কে কুরআন মজীদে বলা হয়েছে :

'যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং নিজেদের জানমাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে; আর যারা তাদের আশ্রয় দিয়েছে এবং তাদের সাহায্য করেছে, তারা একে অপরের বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক। পক্ষান্তরে যারা [শুধু] ঈমান এনেছে কিন্তু হিজরত করে [দারুল ইসলামে] চলে আসেনি, তাদের বন্ধুতা ও পৃষ্ঠপোষকতার দায়িত্ব তোমাদের নয়- যতক্ষণ না তারা হিজরত করলো।" [সূরা আনফাল : ৭২]

এ আয়াতে নাগরিকত্বের দুইটি ভিত্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম ঈমান, দ্বিতীয় দারুল ইসলামের [ইসলামী রাষ্ট্রের] প্রজা [পূর্ব থেকেই কিংবা পরে] হওয়া। একজন মুসলমান তার ঈমান আছে; কিন্তু কাফেরী রাজ্যের আনুগত্য ত্যাগ করে হিজরত করে দারুল ইসলামে এসে যদি বসবাস করতে শুরু না করে, তবে সে দারুল ইসলামের নাগরিক বলে বিবেচিত হতে পারে না। পক্ষান্তরে দারুল ইসলামের সকল ঈমানদার বাসিন্দাগণ দারুল ইসলামের নাগরিক, তাদের জন্ম দারুল ইসলামে হোক কিংবা দারুল কুফর থেকে হিজরত করেই আসুক এবং তারা পরস্পর পরস্পরের সাহায্যকারী ও সহযোগী।[১]

এই মুসলিম নাগরিকদের উপরই ইসলাম তার পরিপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থার দায়িত্বভার চাপিয়ে দিয়েছে। কারণ তারাই নীতিগতভাবে এই ব্যবস্থাকে সত্য বলে মানে। তাদের উপর ইসলাম তার পরিপূর্ণ আইন জারী করে, তাদেরকেই তার সমগ্র ধর্মীয়, নৈতিক, তামাদ্দুনিক এবং রাজনৈতিক বিধানের অনুসারী হতে বাধ্য করে। তার যাবতীয় কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনের ভারও সে তাদের উপরও অর্পণ করে। দেশ ও রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার জন্য সকল প্রকার কুরবানী সে কেবল তাদের নিকটই দাবী করে। অতঃপর সে এই রাষ্ট্রের রাষ্ট্র প্রধান ও অন্যান্য রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা নির্বাচনের অধিকারও তাদেরই দান করে এবং তার পরিচালনার জন্য সংসদে অংশ গ্রহণ এবং তার দায়িত্বপূর্ণ পদসমূহে নিযুক্ত হওয়ার সুযোগও তারাই লাভ করে। যাতে এই আদর্শবাদী রাষ্ট্রের কর্মসূচী তার মূল নীতিসমূহের সাথে সংগতি রেখে

---

১. হিজরত করে যারা আসে তাদের সম্পর্কে কুরআন একটি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা বলেছে যে, এই ধরনের লোকদের পরীক্ষা [Examine] করে দেখা আবশ্যক [সূরা মুমতাহিনা, ১০ নং আয়াত দ্র.]। এই ব্যবস্থা যদিও মুহাজির স্ত্রীলোকদের ব্যাপারে বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু তা থেকে এই সাধারণ মূলনীতি জানা যায় যে, বহিরাগত ও হিজরতের দাবিদার ব্যক্তিকে দারুল ইসলামে গ্রহণ করার পূর্বে তার প্রকৃত মুসলমান ও মুহাজির হওয়া সম্পর্কে নিশ্চয়তা লাভ করতে হবে। যাতে করে হিজরতের সুযোগে ভিন্ন উদ্দেশ্য সম্পন্ন কোনো লোক দারুল ইসলামে প্রবেশ করতে না পারে। কোনো ব্যক্তির প্রকৃত ঈমানের অবস্থা আল্লাহ ভিন্ন আর কেউ জানতে পারে না, কিন্তু বাহ্যিক উপায়ে যতদূর যাচাই করা সম্ভব তা করতে হবে।

বাস্তবায়িত হতে পারে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনকাল এবং খিলাফতে রাশেদার স্বর্ণ যুগ উল্লেখিত মূলনীতির সত্যতা ও যৌক্তিকতার দৃষ্টান্ত। যেমন এ সময় শূরার সদস্য হিসেবে কোনো প্রদেশের গভর্নর হিসেবে কিংবা সরকারী কোনো বিভাগের মন্ত্রী, সেক্রেটারী, বিচারক বা সৈন্য বাহিনীর অধিনায়ক হিসেবে কোনো যিম্মীকে নিযুক্ত করা হয়নি। খলীফা নির্বাচনের ব্যাপারেও তাদের অংশ গ্রহণের সুযোগ দেয়া হয়নি। অথচ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইলি ওয়াসাল্লামের যুগেও ইসলামী রাষ্ট্রে তারা বর্তমান ছিলো। একথা আমাদের বুঝে আসেনা যে, এসব রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজে তাদের অংশ গ্রহণের যদি কোনো অধিকারই থাকতো, তবে আল্লাহর নবী তাদের সে অধিকার কিভাবে হরণ করতে পারেন এবং স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সরাসরি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লোকগণ ক্রমাগতভাবে ত্রিশ বছর পর্যন্ত কেমন করে তাদের অধিকার আদায় না করে থাকতে পারেন।

২. যিম্মী নাগরিক বলতে সেসব অমুসলিমকে বুঝায় যারা ইসলামী রাষ্ট্রের চতুর্সীমার মধ্যে বসবাস করে তার আনুগত্য ও আইন পালন করে চলার অংগীকার করবে, চাই তারা দারুল ইসলামে জন্ম গ্রহণ করে থাকুক কি বাইরের কোনো কাফের রাজ্যে [দারুল কুফর] থেকে এসে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রজা হওয়ার আবেদন করে থাকুক। এই দিক দিয়ে তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হয় না। ইসলাম এই শ্রেণীর নাগরিকদের ধর্ম, সংস্কৃতি, ব্যক্তি আইন [Personal Law] এবং জান মাল ও সম্মানের পূর্ণ নিরাপত্তা দান করে। তাদের উপর রাষ্ট্রের কেবল গণআইন [Public Law] জারী করা হবে। এই গণআইনের দৃষ্টিতে তাদেরকেও মুসলমান নাগরিকদের সমান অধিকার ও মর্যাদা দেয়া হয়। দায়িত্বসম্পন্ন পদ [Key Post] ব্যতীত সকল প্রকার চাকুরীতেও তাদের নিযুক্ত করা যাবে। নাগরিক স্বাধীনতাও তারা মুসলমানদের সমান ভোগ করবে, অর্থনৈতিক ব্যাপারেও তাদের সাথে মুসলমানদের অপেক্ষা কোনোরূপ স্বতন্ত্র আচরণ করা হয় না। রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব থেকে তাদেরকে অব্যাহতি দিয়ে তা সম্পূর্ণরূপে মুসলমানদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে।

এই দুই শ্রেণীর নাগরিকত্ব ও তার পৃথক পৃথক মর্যাদা সম্পর্কে কারো আপত্তি

থাকলে সে যেনো পৃথিবীর অন্যান্য আদর্শবাদী রাষ্ট্র অথবা জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র তার মূলনীতিসমূহ মানতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী সংখ্যালঘু নাগরিকদের প্রতি যে আচরণ করে সে দিকে দৃষ্টিপাত করে। বাস্তবিকই একথা চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলা যায় যে, একটি রাষ্ট্রের মধ্যে তার মূলনীতির সম্পূর্ণ পৃথক মূলনীতিতে বিশ্বাসী, যা অনেক জটিলতার সৃষ্টি করে, ইসলামের চেয়ে অধিক ইনসাফ, সহিষ্ণুতা, উদারতা ও বদান্যতার সাথে অন্য কোনো ব্যবস্থা সে জটিলতার সমাধান করেনি। অন্যরা এ জটিলতার সমাধান প্রায়ই দুইটি পন্থায় করেছে; হয় তাকে [সংখ্যালঘুকে] নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার চেষ্টা করেছে অথবা শূদ্র বা অস্পৃশ্য শ্রেণী বানিয়ে রেখেছে। ইসলাম উপরোক্ত পন্থার পরিবর্তে তার নীতিমালা মান্যকারী ও অমান্যকারীদের মধ্যে ন্যায়ানুগ একটি সীমা নির্ধারণ করে দেয়ার পন্থা গ্রহণ করেছে। ইসলাম তার অনুসারীদেরকে তার নীতিমালা পূর্ণরূপে অনুসরণ করতে বাধ্য করে এবং উক্ত নীতিলামা অনুযায়ী রাষ্ট্রে ব্যবস্থা পরিচালনার দায়িত্বভার তাদের উপর অর্পণ করে। আর যারা তার নীতিমালার অনুসারী নয় তাদেরকে সে দেশের প্রশাসন ব্যবস্থা বহাল রাখার জন্য অত্যাবশ্যক সীমা পর্যন্ত তার বিধান মানতে বাধ্য করে। ইসলাম তাদেরকে রাষ্ট্রে পরিচালনার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়ার সাথে সাথে তাদের যাবতীয় সাংস্কৃতিক ও মানবীয় অধিকার রক্ষার নিশ্চয়তা প্রদান করে।

## নাগরিক অধিকার

এরপর আমাকে বলতে হবে যে, ইসলামে নাগরিকদের কি কি মৌলিক অধিকার [Fundamenatal Rights] স্বীকার করে নেয়া হয়েছে।

সর্ব প্রথম ইসলাম নাগরিকদেরকে জান মাল ও ইজ্জত আব্রুর পূর্ণ নিরাপত্তার অধিকার দান করেছে। আইন সংগত বৈধ কারণসমূহ ব্যতীত অন্য কোনো কারণে তাদের উপর হস্তক্ষেপ করা যাবে না। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রচুর সংখ্যক হাদীসে এই বিষয়টি পরিষ্কারভাবে তুলে ধরেছেন। বিদায় হজ্জের প্রাক্কালে তিনি তাঁর সুপ্রসিদ্ধ ভাষণে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার নীতিমালা বর্ণনা করেছেন। সে ভাষণে তিনি বলেছেন :

"তোমাদের জান, তোমাদের মাল, তোমাদের মান সম্মান তদ্রূপ সম্মানার্হ যেমন আজকের এই হজ্জের দিনটি সম্মানার্হ।"

কেবল একটি অবস্থায় তা সম্মানার্হ থাকবে না। তা তিনি অপর এক হাদীসে এভাবে বলেছেন :

"ইসলামী আইনের আওতায় কারো জান মাল অথবা ইজ্জত আব্রুর উপর কোনো হক [অধিকার] প্রমাণিত হলে আইন অনুমোদিত পন্থায় অবশ্যই তা আদায় করতে হবে।"

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হচ্ছে, যে কোনো নাগরিকের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সংরক্ষণ। দেশে প্রচলিত এবং সর্বজন স্বীকৃত আইন সংগত পন্থায় দোষ প্রমাণ না করে এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে ইসলামে কারও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হরণ করা যায় না। সুনানে আবু দাউদ-এর একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

একদা মদীনার কিছু সংখ্যক লোক কোনো সন্দেহের কারণে বন্দী হয়েছিলো। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে নববীতে ভাষণদানরত অবস্থায় একজন সাহাবী দণ্ডায়মান হয়ে তাঁর নিকট আরজ করলেন, আমার প্রতিবেশীদেরকে কোন্ অপরাধে গ্রেপ্তার করা হয়েছে? মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রশ্নের প্রথম ও দ্বিতীয় বারে কোনো উত্তর না দিয়ে নীরব থাকলেন। শহরের পুলিশ প্রধানকে তাদের গ্রেপ্তারের সংগত কোনো কারণ থাকলে তা পেশ করার সুযোগ দেয়ার জন্য তিনি (সা) নিরুত্তর থাকলেন। ঐ সাহাবী তৃতীয় বার তাঁর প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলে এবং পুলিশ প্রধান নিরুত্তর থাকলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন :

"তার প্রতিবেশীদের ছেড়ে দাও।" [আবু দাউদ, কিতাবুল কাদা]

উপরোক্ত ঘটনা থেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, কোনো সুনির্দিষ্ট অপরাধে দোষী সাব্যস্ত না করা পর্যন্ত কোনো নাগরিককে গ্রেপ্তার করা যাবে না। ইমাম খাত্তাবী (র) তাঁর "মায়ালিমুস সুনান" গ্রন্থে উপরোক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন : "ইসলামে শুধু দুই প্রকারের গ্রেপ্তারী বৈধ। [এক]

শাস্তিস্বরূপ আটক করা অর্থাৎ আদালতের রায়ে কোনো নাগরিককে কয়েদীর শাস্তি প্রদান করা হলে তাকে আটক করা। নিঃসন্দেহে এই আটক সম্পূর্ণ সংগত। [দুই] তদন্তের জন্য আটক করা অর্থাৎ অভিযুক্ত ব্যক্তি বাইরে থাকলে তদন্তকার্যে ব্যাহত হতে পারে এরূপ আশংকা থাকলে তাকে কয়েদ করা যেতে পারে। এতদ্ব্যতীত অন্য প্রকারের আটক বৈধ নয়।" [মায়ালিমুস সুনান, কিতাবুল কাদা]

ইমাম আবু ইউসুফ (র) তাঁর "কিতাবুল খারাজ" গ্রন্থে এই একই কথা বলেছেন। তিনি লিখেছেন, কোনো ব্যক্তিকে নিছক সন্দেহের বশবর্তী হয়ে বন্দী করা যাবে না। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেবল দোষারোপের ভিত্তিতেই কাউকে বন্দী করতেন না। বাদী ও বিবাদী উভয়ই আদালতে হাযির হতে হবে। সেখানে বাদী দলীল প্রমাণসহ তার দাবী উত্থাপন করবে। সে সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থিত করতে ব্যর্থ হলে বিবাদীকে বেকসুর খালাস দিতে হবে। [কিতাবুল খারাজ, পৃ. ১০৭]

হযরত ওমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুও একটি মুকদ্দমার রায় দিতে গিয়ে ঘোষণা করেন :

> "ইসলামে কোনো ব্যক্তিকে বিনা বিচারে বন্দী করে রাখা যাবে না।"
> [মুওয়াত্তা ইমাম মালেক, বাব শারতিশ শাহিদ]

তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ নাগরিক অধিকার হচ্ছে, মত প্রকাশের এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বিষয়টি সম্পর্কে ইসলামী আইনের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা পেশ করেছেন। তাঁর খিলাফত আমলে খারিজী সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হয়েছিলো। বর্তমানকালে নৈরাজ্যবাদী [Nihilist] দলসমূহের সাথে তাদের অনেকটা সামঞ্জস্য ছিলো। আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর খিলাফতকালে তারা প্রকাশ্যে রাষ্ট্রের অস্তিত্বই অস্বীকার করতো এবং অস্ত্রবলে এর অস্তিত্ব বিলোপের জন্য বদ্ধপরিকর ছিলো। আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এই অবস্থায় তাদেরকে নিম্নোক্ত পয়গাম পাঠান :

> "তোমরা যেখানে ইচ্ছা বসবাস করতে পারো। তোমাদের ও আমাদের মাঝে এই চুক্তি রইলো যে, তোমরা রক্তপাত করবে না, ডাকাতি করবে

না এবং কারও উপর যুলুম করবে না।" [নায়লুল আওতার, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১৩০]

অপর এক জায়গায় তিনি তাদের বলেন :

"তোমরা যতক্ষণ বিপর্যয় ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা তোমাদের আক্রমণ করবো না।" [নায়লুল আওতার, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১৩৩]

উপরোক্ত বক্তব্য থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, কোনো দলের মতবাদ যাই হোক না কেন এবং শান্তিপূর্ণভাবে নিজেদের মত যেভাবেই প্রকাশ করুক না কেন, ইসলামী রাষ্ট্র তাতে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে না। কিন্তু তারা যদি নিজেদের মত শক্তি প্রয়োগে [By Violent Means] বাস্তবায়িত করতে এবং রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা চূর্ণ বিচূর্ণ করার চেষ্টা করে তবে তাদের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

আরও একটি মৌলিক অধিকারের প্রতি ইসলাম যথেষ্ট জোর দিয়েছে। তাহলো ইসলামী রাষ্ট্র তার চতুর্সীমার মধ্যে বসবাসকারী কোনো নাগরিককে তার জীবন যাপনের মৌলিক প্রয়োজন থেকে বঞ্চিত রাখতে পারবে না। ইসলাম এ উদ্দেশ্যে যাকাত প্রদান ফরয করেছে এবং এ সম্পর্কে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

"তাদের ধনীদের নিকট থেকে তা আদায় করা হবে এবং তাদের গরীবদের মধ্যে তা বন্টন করা হবে।" [বুখারী ও মুসিলম]

অপর এক হাদীসে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মূলনীতি হিসেবে ইরশাদ করেন :

"যার পৃষ্ঠপোষক বা অভিভাবক নেই, তার পৃষ্ঠপোষক বা অভিভাবক হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্র ও সরকার।"

অপর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

"মৃত ব্যক্তি যে বোঝা [ঋণ অথবা পরিবারের অসহায় সদস্য] রেখে গেলো তার দায়িত্ব আমাদের উপর।" [বুখারী ও মুসলিম]

এ ক্ষেত্রে ইসলাম মুসলিম ও অমুসলিম নাগরিকদের মধ্যে মোটেই পার্থক্য করেনি। কোনো নাগরিককেই অন্ন বস্ত্র ও আশ্রয়হীন অবস্থায় ত্যাগ করা যাবে না। ইসলাম মুসলিম নাগরিকদের মতো তার অমুসলিম নাগরিকের অন্ন বস্ত্র ও বাসস্থানের নিরাপত্তা বিধান করে থাকে। হযরত ওমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এক ইহুদী বৃদ্ধকে ভিক্ষা করতে দেখে তার উপর আরোপিত কর মওকুফ করেন এবং তার জন্য রাজকোষ থেকে ভাতা মঞ্জুর করে রাজকোষ কর্মকর্তাকে লিখে পাঠান :

> "আল্লাহ্‌র শপথ! এ লোকটির যৌবনকালে যদি তার দ্বারা কাজ করিয়ে থাকি এবং এখন তার এই বার্ধক্যে তাকে নিরূপায় অবস্থায় ত্যাগ করি তবে তার সাথে মোটেই সুবিচার করা হবে না।" [ইমাম আবু ইউসুফ, কিতাবুল খারাজ, পৃঃ ৭২]

হযরত খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হীরা নামক এলাকার অমুসলিম নাগরিকদের জন্য যে চুক্তিপত্র লিখে দিয়েছিলেন তাতে পরিষ্কার ভাষায় বলা হয়েছিলো যে, যে ব্যক্তি বার্ধক্যে পৌঁছবে অথবা যে ব্যক্তি আকস্মিক বিপদে পতিত হবে অথবা যে ব্যক্তি গরীব হয়ে যাবে তার নিকট থেকে কর আদায় করার পরিবর্তে রাজকোষ থেকে তার এবং তার পরিবার পরিজনের জীবিকার ব্যবস্থা করা হবে। [কিতাবুল খারাজ, পৃঃ ৮৫]

# অমুসলিমদের অধিকার : কতিপয় মৌলিক প্রশ্নের জবাব

## ক. ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিক

**প্রশ্ন :** আমি হিন্দু মহাসভার কর্মী। গত বছর হিন্দু মহাসভার প্রাদেশিক প্রচার সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছি। কিছুদিন হলো আমি আপনার সম্পর্কে জানতে পেরেছি। ইতোমধ্যে আপনার কতিপয় গ্রন্থও পড়েছি। যেমন : মুসলমান ও বর্তমান রাজনৈতিক সংঘাত ১ম ও ৩য় খণ্ড,[১] ইসলামের রাজনৈতিক মতবাদ, ইসলামী বিপ্লবের পথ ও শান্তি পথ প্রভৃতি। এ গ্রন্থগুলো অধ্যয়নের ফলে ইসলাম সম্পর্কে আমার ধারণার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, এ জিনিসটা যদি আরো কিছুকাল আগে প্রতিষ্ঠিত হতো, তবে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা এতোটা জটিল হতো না। আপনি যে ইসলামী রাষ্ট্রের দাওয়াত দিচ্ছেন, তার অধীনে জীবন যাপন করা গৌরবের বিষয়। তবে কতিপয় প্রশ্ন আছে। এগুলোর জবাবের জন্য চিঠিপত্র ছাড়া প্রয়োজন হলে আমি আপনার সান্নিধ্যে হাযির হবো।

আমার প্রথম প্রশ্ন হলো, ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে হিন্দুদের কি মর্যাদা প্রদান করা হবে ? তাদের কি আহলে কিতাবদের সমপর্যায়ের অধিকার দেয়া হবে নাকি যিম্মী ধরা হবে ? আহলে কিতাব এবং যিম্মীদের অধিকারের বিস্তারিত বিবরণ আপনার উক্ত গ্রন্থগুলোতেও নেই। আরবদের সিন্ধু অভিযানের ইতিহাস আমি যতোটা জানি, তাতে দেখা যায় মুহাম্মাদ বিন কাসিম এবং তার উত্তরসূরীরা সিন্ধুতে হিন্দুদেরকে আহলে কিতাবের অধিকার প্রদান করেছিলো। আশা করি এ বিষয়ে বিস্তারিত ধারণা পেশ করবেন। আহলে কিতাব এবং যিম্মীদের অধিকারের মধ্যে কি পার্থক্য রয়েছে তাও লিখবেন। তারা দেশের প্রশাসনিক কাজে সমানভাবে অংশগ্রহণ করতে পারবে কি ?

১. এ গ্রন্থেগুলো বর্তমানে 'উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুসলমান' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। -সম্পাদক

যদি না পারে তবে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশসমূহে ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে আপনি হিন্দুদেরকে কোন্ মর্যাদা প্রদান করতে চাচ্ছেন ?

দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো, কুরআনের ফৌজদারী বিধানসমূহ মুসলমানদের মতো হিন্দুদের উপরও কার্যকর হবে ? হিন্দুদের জাতীয় আইন [Personal Law] তাদের উপর কার্যকর হবে কিনা ? আমার বক্তব্য হচ্ছে হিন্দুরা তাদের উত্তরাধিকার আইন, যৌথ পরিবার ব্যবস্থা, পালকপুত্র গ্রহণ ইত্যাদি বিধি ব্যবস্থা অনুযায়ী [মনু শাস্ত্রের ভিত্তিতে] জীবন যাপন করতে পারবে কি?

প্রকাশ থাকে যে, প্রশ্নগুলো একজন সত্য সন্ধানীর প্রশ্ন।

**জবাব :** পত্রে প্রকাশিত আপনার ধ্যান ধারণা আমার নিকট সম্মানার্হ। এটা বাস্তব যে ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলিম সম্পর্ককে জটিল ও তিক্ত করার ব্যাপারে সেসব লোকেরাই দায়ী, যারা ন্যায় ও সত্য মূলনীতির পরিবর্তে ব্যক্তিগত, বংশগত, শ্রেণীগত, সম্প্রদায়গত এবং জাতিগত মূলনীতির ভিত্তিতে মানুষের জীবন সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করেছে। এর পরিণাম অনিবার্যভাবেই তাই হওয়ার ছিলো যা এখন আমরা সচক্ষে দেখছি। আমরা আপনারা সকলেই এ মন্দ পরিণতির সমান অংশীদার। কল্যাণ কেউই লাভ করতে পারেনি।

আপনার প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত জবাব ক্রমানুসারে নিম্নে প্রদত্ত হলো :

১. ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে তার অবস্থা এরূপ হবে না যে একটি জাতি আরেকটি জাতি বা অন্য জাতিগুলোর উপর শাসক হয়ে বসবে। বরঞ্চ তার মৌলিক বৈশিষ্ট্য এই হবে যে, একটি আদর্শের ভিত্তিতে দেশে সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে। একথা পরিষ্কার যে, এরূপ রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব দেশের সেসব নাগরিকরাই বহন করতে পারবে যারা হবে উক্ত আদর্শের ধারক ও বাহক। যারা এ আদর্শের ধারক ও বাহক হবে না, অন্তত এর উপর সন্তুষ্ট হবে না, স্বাভাবিকভাবেই তারা এ রাষ্ট্রে যিম্মীর মর্যাদা লাভ করবে। অর্থাৎ তাদের 'নিরাপত্তার যিম্মাদারী' সেসব লোকেরা গ্রহণ করবে যারা উক্ত মূলনীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্রের পরিচালক হবে।

২. আহলে কিতাব এবং সাধারণ যিম্মীদের মধ্যে একটি ছাড়া আর কোনো পার্থক্য থাকবে না। সেটি হচ্ছে এই যে, আহলে কিতাবের মহিলাদেরকে মুসলমানরা বিয়ে করতে পারবে এবং অন্যদের পারবে না। কিন্তু অধিকারের ব্যাপারে আহলে কিতাব এবং অন্য যিম্মীদের মধ্যে কোনো প্রকার পার্থক্য থাকবে না।

৩. যিম্মীদের অধিকারের বিস্তারিত বিবরণ তো এ চিঠিতে দেয়া সম্ভব নয়। তবে এ ব্যাপারে মৌলিক কথা হচ্ছে এই যে, যিম্মী দু'প্রকারের হতে পারে। এক প্রকার হচ্ছে সেসব যিম্মী, যারা কোনো চুক্তির ভিত্তিতে ইসলামী রাষ্ট্রের যিম্মী হয়েছে বা নিরাপত্তা গ্রহণ করেছে। দ্বিতীয় প্রকার যিম্মী হচ্ছে তারা, যারা কোনো প্রকার চুক্তি ছাড়াই যিম্মী হয়েছে। প্রথম ধরনের যিম্মীদের সংগে কৃত চুক্তি মুতাবিক আচরণ করা হবে। দ্বিতীয় প্রকার যিম্মীদের যিম্মী হওয়া দ্বারাই আমাদের উপর এ দায়িত্ব ন্যস্ত হয় যে, আমরা তেমন করে তাদের জান মাল ও ইজ্জত আবরুর হিফাযত করবো যেমন করে হিফাযত করি আমাদের নিজেদের জান, মাল ও ইজ্জত আবরুর। তাদের আইনগত অধিকার তা-ই হবে যা হবে মুসলমানদের। তাদের রক্তমূল্য তা-ই হবে যা মুসলমানদের রক্তমূল্য। নিজেদের ধর্ম পালনের পূর্ণ আযাদী তাদের থাকবে। তাদের উপাসনালয়সমূহ নিরাপদ থাকবে। তাদেরকে তাদের ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানের অধিকার দেয়া হবে এবং বাধ্যতামূলকভাবে তাদের উপর ইসলামী শিক্ষা চাপিয়ে দেয়া হবে না।

৪. অমুসলিমদের "পার্সোনাল ল" তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতার আবশ্যিক অংশ। সুতরাং ইসলামী রাষ্ট্র তাদের বিয়ে, তালাক, উত্তরাধিকার, পালকপুত্র গ্রহণ এবং অনুরূপ অন্যান্য আইন যা দেশীয় আইনের [Law of the land] সাথে সাংঘর্ষিক নয়, তাদের উপর প্রয়োগ করবে। কেবল সেসব ক্ষেত্রে তাদের 'পার্সোনাল ল'কে বরদাশ্‌ত করা হবে না যেগুলোর কুফল জনগণকে প্রভাবিত করবে। যেমন কোনো অমুসলিম জাতি যদি সুদকে বৈধ রাখতে চায় তবে ইসলামী রাষ্ট্রে সুদী লেনদেনের অনুমতি আমরা দেবো না। কারণ এতে গোটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রভাবিত হবে। কিংবা কোনো

অমুসলিম জাতি যদি ব্যভিচার বৈধ রাখতে চায়, তবে এ অনুমতিও আমরা দেবো না। তারা নিজেদের মধ্যেও এ কুকর্মের [Prostitution] ব্যবসা চালু রাখতে পারবে না। কেননা এটা সর্বস্বীকৃতভাবে মানব জাতির নৈতিকতা বিরোধী কাজ। আর এটা আমাদের ফৌজদারী আইনের [Criminal Law] সাথেও সাংঘর্ষিক। একথা স্পষ্ট যে, এটাই হবে রাষ্ট্রীয় আইন। এবার এরি ভিত্তিতে আপনি অন্যান্য বিষয়গুলোর অনুমান করতে পারেন।

৫. আপনি প্রশ্ন করেছেন, অমুসলিমরা ইসলামী রাষ্ট্রের শাসন শৃংখলার কাজে সমান অংশীদার হতে পারবে কিনা ? যেমন পুলিশ, সেনাবাহিনী এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থায় হিন্দুরা অংশ গ্রহণ করতে পারবে কিনা ? যদি না পারে, তবে আপনারা হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশসমূহে মুসলমানদের জন্যে সে অবস্থা মেনে নেবেন কি, ইসলামী রাষ্ট্রে যে মর্যাদা আপনারা হিন্দুদের প্রদান করবেন ? আমার মতে আপনার এ প্রশ্নের ভিত্তি ভুল ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। কারণ এখানে আপনি একদিকে 'আদর্শিক অজাতীয়তা ভিত্তিক রাষ্ট্রের' [Idiological non-National State] সঠিক মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখেননি। অপরদিকে এ প্রশ্নের মধ্যে ব্যবসায়িক লেনদেনের মানসিকতা পরিস্ফুট বলে মনে হচ্ছে।

পহেলা নম্বর জবাবেও আমি একথা বলেছি যে, একটি আদর্শিক রাষ্ট্র পরিচালনা এবং তার নিরাপত্তার দায়িত্ব কেবল সেসব লোকেরাই বহন করতে পারে,যারা সেই আদর্শের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসী। তারাই তো এ আদর্শের মূল স্পিরিট অনুধাবন করতে পারবে। এদের থেকেই তো এ আশা করা যেতে পারে যে, পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে নিজেদের দ্বীনি ও ঈমানী দায়িত্ব মনে করে তারা এ রাষ্ট্রের যাবতীয় কাজ পরিচালনা করবে এবং একে টিকিয়ে রাখার জন্যে প্রয়োজনে লড়াইয়ের ময়দানে নিজেদের জীবন কুরবানী করবে।

যারা এ আদর্শে বিশ্বাসী নয়, তাদেরকে যদি এ রাষ্ট্র পরিচালনা এবং এর নিরাপত্তার দায়িত্বে অংশীদার করাও হয়, তবে তারা এ আদর্শিক এবং নৈতিক স্পিরিট অনুধাবন করতে সক্ষম হবে না। সে অনুযায়ী তারা কাজ

করতেও সক্ষম হবে না। আর এ আদর্শের জন্যে তাদের সেরূপ আন্তরিকতা সৃষ্টি হবে না যার ওপর রাষ্ট্রীয় অট্টালিকার ভিত প্রতিষ্ঠিত থাকবে। তারা যদি বেসামরিক বিভাগে কাজ করে, তবে তাদের কেবল কর্মচারী সুলভ মানসিকতার প্রকাশ পাবে এবং উপার্জনের জন্যেই তারা নিজেদের সময় ও যাবতীয় যোগ্যতা বিক্রি করবে। আর যদি তাদেরকে সামরিক বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করা হয় তবে তাদের অবস্থা হবে ভাড়াটে সৈনিকের [Meucenaries] মতো। তারা নৈতিক চরিত্রের সেই দাবী ও পূর্ণ করতে পারবে না ইসলামী রাষ্ট্র তার মুজাহিদদের থেকে যা আশা করে থাকে।

এ জন্যে আদর্শিক ও নৈতিক কারণে ইসলামী রাষ্ট্র তার সামরিক বাহিনীতে যিম্মীদের কোনো খিদমত গ্রহণ করে না। পক্ষান্তরে যাবতীয় সামরিক নিরাপত্তার দায়িত্ব মুসলমানরা নিজেদের ঘাড়ে তুলে নেয় এবং অমুসলিম নাগরিকদের থেকে শুধু একটা প্রতিরক্ষা কর গ্রহণ করাকেই যথেষ্ট মনে করে। কিন্তু কর এবং সামরিক সেবা এ উভয়টাই একত্রে অমুসলিম নাগরিকদের থেকে নেয়া যেতে পারে না। যদি অমুসলিম নাগরিকরা স্বয়ং নিজেদেরকে সামরিক সেবার জন্যে পেশ করে তবে তা গ্রহণ করা হবে এবং এমতাবস্থায় তাদের থেকে প্রতিরক্ষা কর গ্রহণ করা হবে না।

বেসামরিক বিভাগের Key Postগুলো তো সামরিক বিভাগ থেকেও গুরুত্বপূর্ণ,এগুলো নীতি নির্ধারণী কাজের সাথে সম্পর্কিত। এগুলোতে কোনো অবস্থাতেই অমুসলিম নাগরিকদের নিয়োগ করা যেতে পারে না। অবশ্য কর্মচারী হিসেবে তাদের খিদমত নিতে কোনো দোষ নেই। এমনি করে রাষ্ট্রীয় পরামর্শ সভায় [মজলিশে শূরা] অমুসলিমদের কোনো সদস্য নেয়া হবে না। অবশ্য অমুসলিমদের ভিন্ন কাউন্সিল বানিয়ে দেয়া হবে। এ পরিষদ তাদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের দেখা শুনা ছাড়াও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে তাদের ইচ্ছা ব্যক্ত করবে। তাদের প্রয়োজন, অভিযোগ এবং প্রস্তাবাবলী পেশ করবে। রাষ্ট্রীয় মজলিসে শূরা [Assembly] এগুলো যথোপযুক্তভাবে বিবেচনা করবে।

সোজা কথা হচ্ছে এই যে, 'ইসলামী রাষ্ট্র' কোনো জাতির ইজারাকৃত সম্পত্তি নয়। যে কেউ তার আদর্শ গ্রহণ করবে, সে তার পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করতে পারবে, চাই সে কোনো হিন্দুর পুত্র হোক কিংবা কোনো শিখের

কিন্তু যে এ রাষ্ট্রের আদর্শকে গ্রহণ করবে না, মুসলমানের পুত্র হোক না কেন, সে এ রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা লাভ করবে বটে কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করতে পারবে না।

আপনি প্রশ্ন করেছেন, হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশসমূহে কি মুসলমানরা সে অবস্থা গ্রহণ করবে ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে হিন্দুদেরকে যে পজিশন দেয়া হবে ? এ প্রশ্ন আসলে মুসলিমলীগ নেতাদের কাছে করাই উচিত ছিলো। কারণ লেনদেনের কথা তো তারাই বলতে পারে। আমাদের নিকট জানতে চাইলে আমরা তো নিরেট আদর্শিক জবাবই দেবো।

যেখানে হিন্দুরা রাষ্ট্র ও সরকার প্রতিষ্ঠার অধিকার লাভ করবে, সেখানে আপনারা মূলত দুই ধরনের রাষ্ট্রই প্রতিষ্ঠা করতে পারেন :

হিন্দু ধর্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করতে পারেন, কিংবা ভৌগলিক জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতেও প্রতিষ্ঠা করতে পারেন।

প্রথমোক্ত অবস্থায় আপনাদের মধ্যে এ প্রশ্ন জাগ্রত হওয়া উচিত হবে না যে, ইসলামী রাষ্ট্রে হিন্দুদের যতোটুকু অধিকার দেয়া হবে, আমরা "রামরাজ্যে"ও মুসলমানদেরকে ততোটুকু অধিকারই দেবো। বরঞ্চ এ বিষয়ে হিন্দু ধর্মে যদি কোনো দিক নির্দেশনা থাকে তবে কোনো প্রকার রদবদল ছাড়া হুবহু সেটাই কার্যকর করুন। নিজেদের ধর্মীয় নির্দেশ উপেক্ষা করে এ বিষয়ে অন্যদের অনুসরণ করা ঠিক হবে না। আপনাদের বিধান যদি আমাদের বিধানের চেয়ে উন্নততর হয় তবে নৈতিক ময়দানে আপনারাই বিজয়ী হবেন এবং এমনও হতে পারে যে, আমাদের ইসলামী রাষ্ট্র আপনাদের রামরাজ্যে পরিবর্তন হয়ে যাবে। আর প্রকৃত ব্যাপার যদি এর বিপরীত হয়, তবে দেরীতে হোক কিংবা সত্বর পরিণতি এর বিপরীতই হবে।

আর যদি শেষোক্ত নীতি গ্রহণ করেন, অর্থাৎ ভৌগলিক জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন, তবে এ অবস্থায় আপনাদেরকে দু'টির যে কোনো একটি পথ গ্রহণ করতে হবে। হয়তো গণতান্ত্রিক [Democratic] নীতি অবলম্বন করতে হবে এবং মুসলমানদেরকে তাদের সংখ্যার ভিত্তিতে অংশ নিতে হবে। নয়তো একথা পরিষ্কারভাবে বলে দিতে হবে যে, এটা

হিন্দু জাতির রাষ্ট্র এবং মুসলমানদেরকে এখানে বিজিত জাতি [Subject Nation] হিসেবে থাকতে হবে।

এ দু'টি পন্থার যেটির ভিত্তিতে ইচ্ছা আপনারা মুসলমানদের সাথে আচরণ করতে পারেন। সর্বাবস্থায় আপনাদের নীতি ও আচরণ দেখে ইসলামী রাষ্ট্র তার সেসব নীতিতে বিন্দু পরিমাণ পরিবর্তন সাধন করবে না, অমুসলমানদের ব্যাপারে কুরআন হাদীসে যেগুলো নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। আপনারা যদি আপনাদের রাজ্যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে গণহত্যা অভিযানও চালান, এমনকি একটি মুসলমান শিশুকেও যদি জীবিত না রাখেন, তবু ইসলামী রাষ্ট্র এর প্রতিশোধ নেয়ার জন্য অমুসলিম নাগরিকদের একটি কেশাগ্রও বাঁকা করবে না। পক্ষান্তরে আপনারা যদি প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, সেনাপতি ইত্যাদি পদে মুসলমান নাগরিক মনোনীত করেন, সে অবস্থায়ও ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকদের সে একই মর্যাদা ও অধিকার প্রদান করা হবে যা কুরআন ও হাদীস নির্ধারিত করে দিয়েছে। [তরজমানুল কুরআন : রজব-শাওয়াল ১৩৩৬ হিঃ জুলাই-অক্টোবর ১৯৪৪খৃ.]

## উপরোক্ত বিষয়ের অতিরিক্ত ব্যাখ্যা

প্রশ্ন : আপনার রচিত সবগুলো গ্রন্থ এবং পূর্বের চিঠিটা পড়ার পর আমি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, আপনি নির্ভেজাল ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে ইচ্ছুক। আর এ ইসলামী রাষ্ট্রে যিম্মী এবং আহলে কিতাবের লোকদের পজিশন হবে ঠিক তেমনি, যেমনি হিন্দুদের মধ্যে অচ্ছ্যুতদের পজিশন।

আপনি লিখেছেন, "হিন্দুদের উপাসনালয় সমূহের সংরক্ষণ করা হবে এবং তাদের ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানের অধিকার দেয়া হবে।" কিন্তু হিন্দুদেরকে তাদের ধর্ম প্রচারের সুযোগ দেয়া হবে কিনা সেকথা তো লিখেননি ? আপনি আরো লিখেছেন : "যে কেউ এ রাষ্ট্রের আদর্শ গ্রহণ করবে, সে এর পরিচালনা কাজে অংশ গ্রহণ করতে পারবে, চাই সে হিন্দুর পুত্র হোক কিংবা শিখের" মেহেরবানী করে একথাটারও ব্যাখ্যা দিন যে, হিন্দু হিন্দু থেকেও কি আপনাদের রাষ্ট্রের নীতিমালার প্রতি ঈমান এনে তা পরিচালনার কাজে শরীক হতে পারবে ?

আপনি লিখেছেন আহলে কিতাবের মহিলাদেরকে মুসলমানরা বিয়ে করতে পারবে। কিন্তু আহলে কিতাব মুসলিম মহিলাদের বিয়ে করতে পারবে কিনা সেকথা পরিষ্কার করেননি। এ প্রশ্নের জবাব যদি না সূচক হয়, তবে এ [Superiority complex] সম্পর্কে আরো ভালোভাবে আলোকপাত করবেন কি ? এর যথার্থতার জন্যে আপনি যদি ইসলামের প্রতি ঈমান আনার যিম্মাদারী নেন, তবে কি আপনি একথা মানতে প্রস্তুত আছেন যে, বর্তমানকার তথাকথিত মুসলমান আপনার বক্তব্য অনুযায়ী এসব ইসলামী নীতিমালার মানদণ্ডে টিকে যাবে ? বর্তমানকালের মুসলমানদের কথা বাদই দিলাম, আপনি কি একথা স্বীকার করবেন না যে, খিলাফতে রাশেদার আমলে যেসব লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিলো তাদের অধিকাংশই রাজনৈতিক নেতৃত্বের অভিলাষী ছিলো ? আপনি যদি একথা স্বীকার করে নিতে কুণ্ঠিত হন, তবে বলুন তো সেই ইসলামী রাষ্ট্রটি কেন মাত্র ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছর টিকেছিলো? হযরত আলীর মতো বিচক্ষণ মুজাহিদের এতো বিরোধিতা কেন হয়েছিলো এবং তাঁর বিরোধীদের মধ্যে হযরত আয়েশা পর্যন্ত কেন ছিলেন ?

ইসলামী রাষ্ট্রের অভিলাষী হয়েও আপনি পাকিস্তানের বিরোধিতা করছেন। কোনো রাষ্ট্রীয় সীমা ছাড়াই কি আপনি আপনার হুকুমতে ইলাহিয়া প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন ? অবশ্যই নয়। তবে তো আপনার হুকুমতে ইলাহিয়ার জন্যে সে ভূখণ্ডটিই উপযুক্ত, মিঃ জিন্নাহ এবং তার সংগী সাথীরা যেখানে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। পাকিস্তান না চেয়ে সারা ভারতেই কেন আপনি হুকুমতে ইলাহিয়া প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছেন ? এমন একটি রাষ্ট্র পরিচালনার জন্যে অতি উচ্চমানের নৈতিক চরিত্রের অধিকারী একদল লোক আপনি কোথা থেকে সৃষ্টি করবেন ? যেখানে হযরত আবু বকর, হযরত ওমর এবং হযরত ওসমানের মতো তুলনাহীন মনীষীদের হাতে ঐ রাষ্ট্রটি মাত্র কয়েক বছরের বেশী টিকেনি। আজ চৌদ্দশ' বছর পরে এমন কোন্ উপযুক্ত পরিবেশ আপনি লক্ষ্য করছেন, যার ভিত্তিতে আপনার দূরদৃষ্টি হুকুমতে ইলাহিয়া বাস্তবসম্মত মনে করছেন ? একথা সত্য যে, আপনার পয়গাম সব মত ও পথের মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপক ও দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে। মুসলমানদের সাথে আমার যতো মেশার সুযোগ হয়েছে, তাতে

আমি দেখেছি তারা আপনার চিন্তার প্রতি সহানুভূতিশীল। তারা বলছে : আপনি যা কিছু বলেছেন সেটাই প্রকৃত ইসলাম। কিন্তু প্রত্যেকের মনে সে একই প্রশ্ন যা আমি আপনার সামনে পেশ করলাম। অর্থাৎ খিলাফতে রাশেদার সে আদর্শ রাষ্ট্র পরিচালনার জন্যে সেরূপ উচ্চমানের লোক আপনি কোথায় পাবেন ? তাছাড়া সে তুলনাহীন উচ্চমানের লোকেরাই যখন ঐ রাষ্ট্রটিকে অর্ধ শতাব্দীও সাফল্যের সাথে চালাতে পারেনি, তখন এ যুগে সে ধরনের রাষ্ট্রের চিন্তা একটি অবাস্তব আশা ছাড়া আর কি হতে পারে ?

এছাড়া আরেকটি কথাও নিবেদন করতে চাই।

কিছুকাল পূর্বে আমার ধারণা ছিলো, আমরা হিন্দুরা এমন একটি জাতি যাদের সম্মুখে কোনো একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বর্তমান নেই। অথচ মুসলমানদের সামষ্টিক ও সংঘবদ্ধ জীবন রয়েছে এবং তাদের সম্মুখে রয়েছে একটি মাত্র উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। কিন্তু এখন ইসলামী রাজনীতির গভীর অধ্যয়নের ফলে জানতে পারলাম যে, ওখানকার অবস্থা আমাদের চেয়েও করুণ। বাস্তব অবস্থা আপনার নিকট গোপন নয়। একজন সত্যসন্ধানী হিসেবে আমি বিভিন্ন ধ্যান ধারণার মুসলিম নেতৃবৃন্দের নিকট তাদের উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থা সম্পর্কে কতিপয় বিষয়ের জবাব চেয়ে পাঠাই। তাদের জবাব আমার হাতে পৌঁছার পর আমার পূর্ব ধারণা ভ্রান্ত প্রমাণ হয়েছে। এখন আমি জানতে পারলাম, মুসলমানদের মধ্যেও কর্মপন্থা ও উদ্দেশ্য লক্ষ্যের ব্যাপারে সাংঘাতিক মতবিরোধ রয়েছে। [প্রশ্নকারী এখানে জামায়াতে ইসলামীর সাথে মতবিরোধ রাখেন এমন কতিপয় ব্যক্তির লেখা থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করেন।]

দেখলেন তো আপনাদের একই আকীদা বিশ্বাসের নেতাগণ কতো কঠিন মতবিরোধে নিমজ্জিত। এসব বাস্তব সত্যকে উপেক্ষা করে কোনো কিছু কেবল বইয়ের পৃষ্ঠায় মতাদর্শ হিসেবে উপস্থাপন করা এক জিনিস আর সেটার বাস্তবায়ন একটা সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। রাজনীতি একটা বাস্তব সত্য ব্যাপার। এটাকে কোনো অবস্থাতেই অস্বীকার করা যেতে পারে না। আমার এ গোটা নিবেদনকে সামনে রেখে আপনি আপনার কর্মপন্থা ও কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত অবগত করাবেন কি ?

**জবাব :** আপনার প্রশ্নাবলীর মূল টার্গেটি এখনো আমার কাছে পৌঁছায়নি। এ কারণে যে জবাব দিচ্ছি সেগুলো থেকে আপনার আরো এমন কিছু প্রশ্ন সৃষ্টি হচ্ছে, যেগুলো সৃষ্টি হওয়ার অবকাশ আমার কাছে নেই। আপনি যদি মৌলিক বিষয় থেকে প্রশ্ন আরম্ভ করেন, অতঃপর শাখা প্রশাখা এবং সমসাময়িক রাজনীতির [Current politics] দিকে প্রত্যাবর্তন করেন, তবে আপনি আমার জবাবের সাথে পূর্ণ একমত না হলেও অন্ততপক্ষে আমাকে পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারবেন। এখন তো আমার মনে হয়, আমার পজিশন আপনার নিকট পুরোপুরি স্পষ্ট নয়।

আপনি লিখেছেন, আপনি যে ইসলামী রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখছেন, তাতে "যিম্মী এবং আহলে কিতাবের পজিশন তাই হবে, যা নাকি হিন্দুদের মধ্যে অচ্ছ্যুতদের।" বাক্যটি দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি। আমি স্পষ্টভাবে লেখার পরও আপনি হয়তো ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকদের পজিশন সম্পর্কে বুঝতে পারেননি। নয়তো হিন্দু সমাজে অচ্ছ্যুতদের পজিশন সম্পর্কে আপনি ওয়াকিফহাল নন। প্রথম কথা, অচ্ছ্যুতদের যে পজিশন মনুর ধর্মশাস্ত্র থেকে জানা যায়, তার সাথে ঐ সকল অধিকার ও সুযোগ সুবিধার কোনো সম্পর্ক নেই, ইসলামী ফিক্‌হ শাস্ত্রে যা যিম্মীদের প্রদান করা হয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা হলো, এ অস্পৃশ্যবাদের ভিত্তি হচ্ছে বংশগত তারতম্য। পক্ষান্তরে যিম্মীর ভিত্তি হচ্ছে আদর্শ ও বিশ্বাস। কোনো যিম্মী ইসলাম গ্রহণ করলে তিনি আমাদের নেতা এবং রাষ্ট্রপ্রধান পর্যন্ত হতে পারেন। কিন্তু শুদ্র তার বিশ্বাস এবং মত ও পথ পরিবর্তনের পরও কি অরুণ আশ্রমের বিধি নিষেধ থেকে মুক্ত হতে পারে ?

আপনি প্রশ্ন করেছেন, "কোনো হিন্দু কি হিন্দু থেকেও আপনাদের রাষ্ট্রীয় আদর্শের প্রতি ঈমান এনে তা পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করতে পারবে ?" – আপনার এ প্রশ্ন খুবই বিস্ময়কর। সম্ভবত আপনি চিন্তা করে দেখেননি যে, ইসলামী রাষ্ট্রের আদর্শের প্রতি ঈমান আনার পর হিন্দু আর হিন্দু থাকবে না, বরঞ্চ সে মুসলমান হয়ে যাবে। এ দেশের কোটি কোটি মুসলমান তো আসলে হিন্দুরই সন্তান। ইসলামী আদর্শের প্রতি ঈমান আনার ফলেই তারা মুসলমান হয়েছে। এমনি করে ভবিষ্যতেও যেসব হিন্দুর সন্তান এ আদর্শ

গ্রহণ করবে, তারাও মুসলমান হয়ে যাবে। আর তারা যখন মুসলমান হয়ে যাবে, তখন অবশ্যি ইসলামী রাষ্ট্রে পরিচালনার ক্ষেত্রে তারা আমাদের সংগে সমান অংশীদার হবে।

'ইসলামী রাষ্ট্রে হিন্দুরা তাদের ধর্ম প্রচারের সুযোগ পাবে কি ? আপনার এ প্রশ্নটি যতোটা সংক্ষিপ্ত তার জবাব ততোটা সংক্ষিপ্ত নয়। প্রচার কাজ কয়েক প্রকারের হতে পারে। এক প্রকার হচ্ছে এই যে, কোনো ধর্মীয় গোষ্ঠী তার ভবিষ্যত বংশধর এবং নিজ জনগণকে নিজস্ব ধর্মের শিক্ষা প্রদান করবে। সকল প্রকার যিম্মীরাই এমনটি করার অধিকার লাভ করবে। দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে, কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায় লেখনী কিংবা বক্তৃতার মাধ্যমে নিজ ধর্মকে অন্যান্য সম্প্রদায়ের নিকট পেশ করবে এবং ইসলামসহ অন্য সকল ধর্মের সাথে তাদের মতভেদের কারণ জ্ঞানের যুক্তিতে পেশ করবে। এর অনুমতিও যিম্মীদের প্রদান করা হবে। কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্রের অধিবাসী থাকা অবস্থায় আমরা কোনো মুসলমানকে নিজের ধর্ম পরিবর্তনের অনুমতি দেবো না। তৃতীয় প্রকার হচ্ছে, কোনো গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় নিজেদের ধর্মীয় আদর্শের ভিত্তিতে এ উদ্দেশ্যে কোনো সংগঠিত আন্দোলন গড়ে তুলবে যে বর্তমান রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করে ইসলামী আদর্শের পরিবর্তে তার নিজের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করবে, আমাদের রাষ্ট্রীয় সীমার মধ্যে এরূপ প্রচার কার্যের অধিকার কাউকেও প্রদান করবো না। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা সম্বলিত আমার প্রবন্ধ 'ইসলামে মুরতাদ হত্যার নির্দেশ' দেখে নিন।[১]

মুসলমানদের জন্য আহলে কিতাবের নারীদের বিয়ে করা বৈধ হওয়া এবং আহলে কিতাবের জন্যে মুসলিম নারীদের বিয়ে অবৈধ হওয়ার ভিত্তি এক নিগূঢ় সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। পুরুষরা সাধারণত প্রভাবিত হয় কম এবং প্রভাব বিস্তার করে অধিক। আর নারীরা সাধারণত প্রভাবিত হয় বেশী এবং প্রভাব বিস্তার করে কম। একজন অমুসলিম নারী যদি মুসলমানের সংগে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় তবে তার দ্বারা এ মুসলমান ব্যক্তিকে অমুসলিম বানানোর আশংকা খুবই কম, বরঞ্চ তারই মুসলমান হয়ে যাবার সম্ভাবনা

১. প্রবন্ধটি পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়েছে।

বেশী। কিন্তু একজন মুসলিম নারী কোনো অমুসলিম ব্যক্তির বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলে তার অমুসলিম হয়ে যাবার আশংকাই বেশী এবং তার স্বামী ও সন্তানদের মুসলমান বানাতে পারার সম্ভাবনা খবুই কম। এ জন্যে নিজ কন্যাদের অমুসলিমদের নিকট বিয়ে দেবার অনুমতি মুসলমানদের দেয়া হয়নি। অবশ্য আহলে কিতাবের কোনো ব্যক্তি নিজ কন্যাকে কোনো মুসলমানের নিকট বিয়ে দিতে রাজী হলে সে তাকে বিয়ে করতে পারবে। কিন্তু কুরআনের যে স্থানে এ অনুমতি প্রদান করা হয়েছে সেখানে এ ধমকও দেয়া হয়েছে যে, তোমরা যদি অমুসলিম স্ত্রীদের প্রেমে বিগলিত হয়ে নিজেদের দ্বীন খুইয়ে ফেলো তবে তোমাদের সমস্ত সৎকর্ম বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকবে। তাছাড়া এ অনুমতি কেবল বিশেষ প্রয়োজনের সময়ই কার্যকর করা যাবে। এটা কোনো সাধারণ অনুমতি নয় এবং পছন্দনীয় কাজও নয়, বরঞ্চ কোনো কোনো অবস্থায় তো এ কাজ করতে নিষেধও করা হয়েছে, যাতে মুসলিম সোসাইটিতে অমুসলিম লোকদের আনাগোনার ফলে কোনো অনাকাংখিত নৈতিক ও ধ্যান ধারণার বিকাশ ও লালন হতে না পারে।

ইসলামী রাষ্ট্রে কেন মাত্র ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছরের বেশী টিকেনি আপনার এ প্রশ্ন একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত। আপনি যদি খুব মনোযোগের সাথে ইসলামের ইতিহাস অধ্যয়ন করেন, তবে এর কারণসমূহ অনুধাবন করা আপনার জন্যে কোনো কঠিন ব্যাপার হবে না। কোনো আদর্শের পতাকাবাহী দল যে জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে তা তার পরিপূর্ণ মর্যাদার সাথে পরিচালিত হওয়া এবং টিকে থাকার জন্যে প্রয়োজন-এর নেতৃত্ব এমন বাছাইকৃত লোকদের হাতে থাকা যারা হবে সে আদর্শের প্রকৃত ও পরিপূর্ণ অনুসারী। আর এ ধরনের লোকদের হাতে নেতৃত্ব কেবল সে অবস্থায়ই থাকতে পারে, যখন সাধারণ লোকদের উপর এদের প্রভাব বজায় থাকবে এবং সাধারণ নাগরিকদের একদল বিরাট সংখ্যক লোক এতোটা শিক্ষা দীক্ষা ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হবে, যাতে করে এ আদর্শের সাথে তাদের গভীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং তারা ঐসব লোকদের কথা শুনতে সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত হয়ে যায়, যারা তাদেরকে তাদের এ নির্দিষ্ট আদর্শের বিপরীত অন্য

কোনো পথে চালাতে উদ্যত হয়। একথা ভালোভাবে বুঝে নেয়ার জন্য ইসলামের ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে একটি সামাজিক বিপ্লব সংঘটিত হয়ে যে নতুন জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়, তার বুনিয়াদী কথা এ ছিলো যে, আরব ভূখণ্ডে এক প্রকার নৈতিক বিপ্লব সাধিত হয়েছে এবং নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নেতৃত্বে সৎ লোকদের যে ছোট দলটি তৈরী হয়েছিলো, গোটা আরববাসী তাঁর নেতৃত্ব কবুল করে নিয়েছিলো। কিন্তু পরবর্তীকালে খিলাফতে রাশেদার যুগে যখন দেশের পর দেশ জয় হতে লাগলো, তখন যতোটা দ্রুত ইসলামী রাজ্যের চৌহদ্দী বিস্তৃত হতে থাকলো, আদর্শিক মজবুতি ততোটা দ্রুততার সাথে এগুনো সম্ভব হয়নি। সে যুগে যেহেতু প্রচার প্রকাশনা এবং প্রচার ও প্রশিক্ষণের ব্যাপক কোনো মাধ্যম ছিলো না, যেমনটি রয়েছে বর্তমানে, সে যুগে বর্তমানকালের মতো যানবাহনও যেহেতু ছিলো না, এসব কারণে তখন যেসব লোক দলে দলে ইসলামী সমাজে প্রবেশ করছিলো নৈতিক, মানসিক এবং আমলী দিক থেকে তাদের পূর্ণাংগভাবে ইসলামী আন্দোলনের ছাঁচে গড়ে তোলার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি। এর ফলে সাধারণ মুসলমান বাসিন্দাদের মধ্যে খাঁটি ধরনের মুসলমানদের সংখ্যা আনুপাতিক হারে একেবারে কম হয়ে যায় এবং কাঁচা ধরনের মুসলমানদের আনুপাতিক হার বিপুল সংখ্যায় বেড়ে যায়। কিন্তু আদর্শিক দিক দিয়ে মুসলমানদের ক্ষমতা, অধিকার এবং মর্যাদা খাঁটি ধরনের মুসলমানদের তুলনায় ভিন্নতর হওয়া মোটেই সম্ভব ছিলো না। এ কারণে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর খিলাফতকালে যখন প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলনসমূহের[১] [Reactionary Movements] ধুম্রজাল সৃষ্টি হয়, তখন সাধারণ মুসলমানদের এক বিরাট অংশ তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়ে এবং যারা বিশুদ্ধ ইসলামী পদ্ধতিতে রাষ্ট্র পরিচালনার যোগ্যতা রাখতেন তাদের হাত থেকে নেতৃত্ব ছুটে যায়। এ ঐতিহাসিক নিগূঢ় সত্যকে উপলব্ধি করার পর খালিস ইসলামী রাষ্ট্র ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছরের বেশী টিকে ছিলো না সে প্রশ্ন জাগ্রত হবার কোনো অবকাশই থাকে না।

---

১. অর্থাৎ যেসব আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিলো ইসলাম থেকে প্রত্যাবর্তন করে কোনো না কোনো জাহেলিয়াতের দিকে ফিরে যাওয়া।

আজো যদি আমরা সৎ লোকদের এমন একটি দলকে সুসংগঠিত করতে পারি, যাদের ধ্যান ধারণা ও মানসিকতা এবং সীরাত ও নৈতিক চরিত্র হবে ইসলামের বাস্তব নমুনা, তবে আমি আশা রাখি– আধুনিক উপায় উপকরণ ব্যবহার করে আমরা শুধু আমাদের দেশেই নয়, বরঞ্চ অন্যান্য দেশেও একটি নৈতিক ও সামাজিক বিপ্লব সংঘটিত করতে সক্ষম হবো। আমার দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে যে, এমন লোকদের একটি শক্তিশালী সংগঠন কায়েম হয়ে যাবার পর সাধারণ মানুষের নেতৃত্ব তাদের ছাড়া অন্য কোনো পার্টির হাতে যেতে পারে না। মুসলমানদের বর্তমান অবস্থা থেকে আপনি যে মত প্রতিষ্ঠা করেছেন, ঐ উজ্জ্বল অবস্থার সংগে তার তুলনা হতে পারে না যা আমাদের সম্মুখে রয়েছে।

বিশুদ্ধ নৈতিক চরিত্রের অধিকারী লোকেরা বাস্তব ময়দানে নেমে এলে শুধু মুসলমান জনসাধারণেরই নয়, বরঞ্চ হিন্দু, খৃষ্টান, পারসিক, শিখ সকলেই তাদের ভক্ত অনুরক্ত হয়ে যাবে এবং নিজেদের ধর্মীয় নেতাদের ত্যাগ করে এদের প্রতি আস্থাশীল হয়ে যাবে। শিক্ষা দীক্ষা দিয়ে সুসংগঠিত করার মাধ্যমে এমন একদল লোক তৈরী করার কাজ এখন আমি হাতে নিয়েছি। আমি আল্লাহ্‌র নিকট বিনয়াবনত হয়ে দোয়া করছি, তিনি যেনো এ কাজে আমাকে সাহায্য করেন।

## খ. ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের অধিকার

প্রশ্ন : ইসলামী রাষ্ট্রে খৃষ্টান ইহুদী, বৌদ্ধ, জৈন, পারসিক প্রভৃতি সংখ্যালঘু সম্প্রদায় কি মুসলমানদের মতো যাবতীয় অধিকার ভোগ করতে পারবে ? আজকাল পাকিস্তান এবং অন্যান্য দেশে যেভাবে এসব সম্প্রদায়ের লোকেরা অবাধে ধর্ম প্রচারে লিপ্ত, ইসলামী রাষ্ট্রে কি তারা তেমনিভাবে নিজ নিজ ধর্ম প্রচার করতে পারবে ? মুক্তিফৌজ [Salvation Army], ক্যাথড্রোল, কনভেন্ট, সেন্ট জন, সেন্ট ফ্রান্সিস ইত্যাকার ধর্মীয় অথবা আধা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান কি আইন প্রয়োগ করে বন্ধ করে দেয়া হবে ? [সম্প্রতি শ্রীলংকায় অথবা অন্যান্য দু'একটি দেশে যেমন হয়েছে।] অথবা মুসলমান শিশুদের কি ঐসব প্রতিষ্ঠানে অবাধে আধুনিক শিক্ষা লাভের অনুমতি দেয়া হবে ? এই শতাব্দীতেও এসব সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কাছ থেকে জিযিয়া আদায় করা

সমীচীন হবে কি [বিশ্ব মানবাধিকার সনদের আলোকে বিবেচ্য]? বিশেষত তারা যখন সেনাবাহিনী ও সরকারী চাকরীতে নিয়োজিত এবং সরকারের অনুগত ?

**জবাব :** ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম সম্প্রদায়গুলো সকল নাগরিক অধিকার [Civil rights] মুসলমানদের মতোই ভোগ করবে। তবে রাজনৈতিক অধিকারে [Political Rights] তারা মুসলমানদের সমকক্ষ হতে পারে না। কারণ ইসলামে রাষ্ট্রীয় প্রশাসন চালানো মুসলমানদের দায়িত্ব। মুসলমানদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যেখানেই তারা শাসন ক্ষমতার অধিকারী হবে, সেখানে যেনো তারা কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষা মুতাবিক সরকারী প্রশাসন চালায়। যেহেতু অমুসলিমরা কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষাও মানে না, তার প্রেরণা ও চেতনা অনুসারে বিশ্বস্ততার সাথে কাজ করতেও সক্ষম নয়, তাই তাদেরকে এ দায়িত্বে অংশীদার করা চলে না। তবে প্রশাসনে এমন পদ তাদেরকে দেয়া যেতে পারে, যা নীতিনির্ধারক পদ নয়। এ ব্যাপারে অমুসলিম সরকারগুলোর আচরণ হয়ে থাকে মুনাফিকী ও ভন্ডামীতে পরিপূর্ণ। কিন্তু ইসলামী সরকারের আচরণ হয়ে থাকে নিরেট সততার প্রতীক। মুসলমানরা তাদের এ নীতি খোলাখুলিভাবে জানিয়ে দেয়া এবং এর প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের বেলায় আল্লাহ্‌র কাছে জবাবদিহির অনুভূতি নিয়ে অমুসলিম নাগরিকদের সাথে সর্বোচ্চ উদারতা ও ভদ্রতার আচরণ করে থাকে। আর অমুসলিমরা বাহ্যত লিখিতভাবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলোকে [National minirities] যাবতীয় অধিকার প্রদান করে বটে, কিন্তু বাস্তবে মানবিক অধিকারও দেয় না। এতে যদি কারো সংশয় থাকে, তবে সে যেনো আমেরিকায় নিগ্রোদের সাথে, রাশিয়ায় অকম্যুনিষ্টদের সাথে এবং চীন ও ভারতের মুসলমানদের সাথে কি আচরণ করা হচ্ছে তা দেখে নেয়। অনর্থক অন্যদের সামনে লজ্জাবোধ করে আমাদের নিজস্ব নীতি খোলাখুলি বর্ণনা না করা এবং সে অনুসারে দ্বিধাহীন চিত্তে কাজ না করার কি কারণ থাকতে পারে তা আমার বুঝে আসে না।

অমুসলিমদের ধর্ম প্রচারের ব্যাপারটা অবশ্য আলাদা। এটা আমাদের ভালোভাবে বুঝে নেয়া দরকার যে, আমরা যদি একেবারে আত্মহত্যার জন্য প্রস্তুত না হই, তাহলে আমাদের দেশে অমুসলিমদের ধর্ম প্রচারের অনুমতি

দিয়ে শক্তিশালী সংখ্যালঘু সম্প্রদায় গড়ে উঠতে দেয়ার মতো নির্বুদ্ধিতা কাজ করা সংগত হবে না। বিদেশী পুঁজির দুধ কলা খেয়ে ও বিদেশী সরকারের আস্কারা পেয়ে সংখ্যালঘুরা লালিত পালিত হোক এবং শক্তি ও সংখ্যা বৃদ্ধি করে ফুলে ফেঁপে উঠে তুরস্কের মতো সংখ্যালঘু খৃষ্টানরা আমাদেরকেও সংকটে ফেলে দিক, এটা কিছুতেই হতে দেয়া হবে না।

খৃষ্টান মিশনারীদের এখানে বিদ্যালয় ও হাসপাতাল চালু রেখে মুসলমানদের ঈমান খরিদ করার এবং মুসলমানদের নতুন বংশধরদেরকে আপন জাতীয় ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করার [De-nationalise] অবাধ অনুমতি দেয়াও আমার মতে জাতীয় আত্মহত্যা ছাড়া আর কিছু নয়। আমাদের শাসকরা এ ব্যাপারে চরম অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে। নিকটবর্তী উপকারিতা তো তাদের বেশ চোখে পড়ে কিন্তু সুদূর প্রসারী কুফল তারা দেখতে পায় না।

ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের কাছ থেকে জিযিয়া আদায়ের নির্দেশ দেয়া হয় কেবল তখনই, যখন তারা বিজিত হয় অথবা কোনো চুক্তির ভিত্তিতে জিযিয়া দেয়ার সুস্পষ্ট শর্ত অনুসারে তাদেরকে ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব দেয়া হয়। পাকিস্তানে যেহেতু এই দুই অবস্থার কোনোটাই দেখা দেয়নি, তাই এখানে অমুসলিমদের ওপর জিযিয়া আরোপ করা শরীয়তের বিধান অনুসারে জরুরী নয় বলে আমি বলে করি। [তরজমানুল কুরআন, অক্টোবর ১৯৬১]